POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

আহমদীয়া সংবাদ

খণ্ড 11

সাপ্তাহিক
বদর
কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা 23

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

বাৎসরিক চাঁদা
৬০০ টাকা

www.akhbarbadarqadian.in

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 4 June 2026 17 জুল হজ্জা 1447 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُہُمۡ بِذِکۡرِ اللّٰہِ
اَلَا بِذِکۡرِ اللّٰہِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ○

অনুবাদ:"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। শুনে রাখো! আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়সমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"

-(সূরা আর-রা'দ, ১৩:২৯;)

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যে ঘরে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা হয় না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।" অর্থাৎ, যে আল্লাহর যিকির করে সে জীবিত, আর যে যিকির করে না সে মৃতের ন্যায়।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন: "যে ঘরে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা হয় না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ-দা'ওয়াত, বাবু ফাদলি যিকরিল্লাহি তা'আলা; সহীহ মুসলিম, কিতাবুস-সালাত, বাবু ইস্তিহবাবি সালাতিন-নাফিলাহ ফী বাইতিহি ওয়া জাওয়াজিহা ফিল-মাসজিদ)

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার মহানবী (সা.) আমাদের নিকট আগমন করে বললেন: "হে লোকসকল! তোমরা জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণ করার চেষ্টা করো।"

আমরা আরয করলাম: "হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

তিনি (সা.) বললেন:"যিকিরের মজলিসসমূহই জান্নাতের বাগান।"

তিনি (সা.) আরও বললেন: "বিশেষত সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করো। যে ব্যক্তি জানতে চায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা কতখানি, সে যেন দেখে আল্লাহ সম্পর্কে তার ধারণা ও চিন্তা কেমন। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি ততটুকুই মর্যাদা ও মূল্য প্রদান করেন, যতটুকু মর্যাদা ও গুরুত্ব সেই বান্দার হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য বিদ্যমান থাকে।"

(রিসালায়ে কুশাইরিয়্যাহ, বাবুয-যিকর, পৃষ্ঠা ১১১) (সূত্র: হাদীকাতুস সালেহীন, হাদীস নং ৭৫-৭৬)

আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

"যখনই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সামান্যতম দুঃখ বা উদ্বেগের সম্মুখীন হতেন, তখনই তিনি নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

'শোন! আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।' (সূরা আর-রা'দ ১৩:২৯)

হৃদয়ের শান্তি, প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভের জন্য নামাযের চেয়ে উত্তম কোনো উপায় নেই।" (আল-হাকাম, খণ্ড ৭, সংখ্যা ২০, ৩১ মে ১৯০৩, পৃষ্ঠা ৯)

"পবিত্র কুরআন থেকে এ কথাই জানা যায় যে, আল্লাহর স্মরণ এমন এক বিষয় যা হৃদয়কে প্রশান্তি ও তৃপ্তি দান করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

'শোন! আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।' অতএব, যতদূর সম্ভব মানুষের উচিত আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকা, কারণ এর মাধ্যমেই প্রকৃত প্রশান্তি অর্জিত হয়। তবে এর জন্য ধৈর্য ও পরিশ্রম প্রয়োজন। যদি কেউ অস্থির হয়ে পড়ে, নিরুৎসাহিত হয় বা ক্লান্ত হয়ে যায়, তাহলে সে এই প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পারবে না।" (আল-হাকাম, খণ্ড ৯, সংখ্যা ২৬, ১০ জুলাই ১৯০৫, পৃষ্ঠা ৮)

"'শোন! আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'

এই আয়াতের সাধারণ অর্থ হলো, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু এর গভীরতর তাৎপর্য ও দর্শন হলো এই যে, যখন একজন মানুষ আন্তরিক নিষ্ঠা ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সর্বদা নিজেকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত বলে অনুভব করে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের এক গভীর ভয় ও শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নেয়।

এই ভয় তাকে অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে রক্ষা করে এবং সে তাকওয়া (ধর্মভীরুতা) ও পবিত্রতায় ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার ওপর অবতীর্ণ হন এবং তাকে সুসংবাদ প্রদান করেন। তার জন্য ঐশী ওহীর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সেই অবস্থায় সে যেন আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করছে এবং দৃশ্যমান জগতের ঊর্ধ্বে তাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তিসমূহের সাক্ষাৎ লাভ করছে। এরপর তার হৃদয়কে কোনো দুশ্চিন্তা, দুঃখ বা বেদনা আর আচ্ছন্ন করতে পারে না। তার স্বভাব সর্বদা প্রফুল্লতা, আনন্দ ও আধ্যাত্মিক সুখে পরিপূর্ণ থাকে।"

(আল-হাকাম, খণ্ড ৯, সংখ্যা ৩২, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, পৃষ্ঠা ২)(সূত্র: তাফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯১-৯২)

"তোমরা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠো এবং তাঁরই স্নেহ, মমতা ও অনুগ্রহের ছায়াতলে তোমাদের জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করো।

তাফসির: আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন তোমরা আল্লাহ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী বায়তুল্লাহর হজের ফরয আদায় সম্পন্ন করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করো, যেমন তোমরা নিজেদের পিতা-পিতামহদের স্মরণ করতে। আরবদের মধ্যে প্রথা ছিল যে, তারা হজ শেষ করার পর মিনায় তিন দিন অবস্থান করে বিভিন্ন সভা বসাত এবং নিজেদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা বর্ণনা করত। তারা নিজ নিজ গোত্রের বীরত্ব, খ্যাতি ও উদারতার প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা তো নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রশংসায় কাব্য রচনা করত; কিন্তু আমি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, যখন তোমরা হজের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা নিজেদের পিতা-পিতামহদের স্মরণ কর। অর্থাৎ, যেমন একটি ছোট শিশু তার মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কান্নাকাটি করতে করতে বলে, "আমি আমার মায়ের কাছে যাবচ, তেমনি তোমরাও বারবার আল্লাহর জিকির করো, যাতে তাঁর ভালোবাসা তোমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে যায়।

আল্লাহ তাআলা এক অতীন্দ্রিয় সত্তা। তাঁর সৌন্দর্য মানুষের সামনে সরাসরি প্রকাশিত হয় না; বরং বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। যদি তাঁর সৌন্দর্যকে শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয় এবং আমরা তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও মনন করি, তবে ধীরে ধীরে অর্থগতভাবে তাঁর একটি চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

যদি তোমরা মালিক(সর্বাধিপতি)-এর নাম উচ্চারণ করো এবং তাঁর মালিকানার গুণাবলি মনে আনো; কুদ্দুস(পরম পবিত্র)-এর নাম উচ্চারণ করো এবং তাঁর পবিত্রতার কথা চিন্তা করো; সাত্তার (দোষ আচ্ছাদনকারী)-এর নাম উচ্চারণ করো এবং তাঁর দোষ-ঢেকে-রাখার গুণ স্মরণ করো; গফুর(পরম ক্ষমাশীল)-এর নাম উচ্চারণ করো এবং তাঁর ক্ষমাশীলতার কথা মনে আনো-তবে স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে আল্লাহ তাআলার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি তোমাদের সামনে গড়ে উঠবে।

অর্থাৎ, যদি প্রিয়তম স্বয়ং সামনে উপস্থিত না হন, তবে অন্তত তাঁর কণ্ঠস্বর তো শোনা যাক, অথবা তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমার কোনো নিদর্শন তো চোখে পড়ুক।

অতএব, যখন আমরা রব, রহমান, রহীম,মালিকে

এরপর ৮ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

১৬ই মে, ২০২৬ জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে আয়োজিত ১৯তম পিস সিম্পোজিয়াম-এ
সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো, একজন মানুষ অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। এটি এমন এক স্বর্ণালী নীতি যে, যদি সমগ্র বিশ্ব এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে পৃথিবী সত্যিকার অর্থেই শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত হতে পারে।

সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, যার জন্য আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমরা এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করি, যাতে অন্তত কিছু মানুষের কাছেও আমাদের সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের বার্তা পৌঁছে যায়। এ উদ্দেশ্যেই আমি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের নিকট পত্র লিখেছি।

ইসলাম শুধু মিত্রদের অধিকারই প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং প্রতিদ্বন্দ্বীদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের উপদেশ দিয়েছে যে, যদি তোমরা কোনো অন্য জাতির কাছ থেকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা কল্যাণকর কোনো কথা পাও, তবে তা গ্রহণ করো; কারণ সেটি মূলত তোমাদেরই হারিয়ে যাওয়া সম্পদ।

আজ আমাদের সকলের কর্তব্য হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী রেখে যাওয়া এবং সে লক্ষ্যে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা।

অন্যথায় আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে দায়ী করবে এবং প্রশ্ন করবে–তোমরা আমাদের জন্য কেমন বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবী রেখে গিয়েছ?

তাশাহুদ এবং তাসমিয়াহ পাঠ করার পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনারা সবাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, এজন্য আমি আন্তরিকভাবে এবং হৃদয়ের গভীর থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গত দুই দশক ধরে পিস সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে আসছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষাপটে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, এসব প্রচেষ্টার বাস্তবিক ফলাফল কী হয়েছে?

নিঃসন্দেহে এটি একটি যৌক্তিক প্রশ্ন। তবে ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ক্লান্তি বা নিরুৎসাহিত না হয়ে আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করার চেয়ে উত্তম প্রচেষ্টা আর কী হতে পারে?

যদি আমরা যুদ্ধ, সংঘাত, অশান্তি, ঘৃণা এবং অবিচারের প্রতিকার না করি, তবে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস হতে দেখব। এ ধরনের ধ্বংসের পরিণতি এতটাই ভয়াবহ হবে যে, ভবিষ্যতের বহু প্রজন্মও এর প্রভাব ভোগ করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তবে মনে রাখা উচিত যে, সে সময় কেবল যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। কিন্তু আজ বহু দেশ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। তদুপরি, বর্তমান যুগের পারমাণবিক অস্ত্রগুলো সে সময়ের অস্ত্রগুলোর তুলনায় বহুগুণ বেশি বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক।

আজ আমি আপনাদের সামনে কিছু গবেষক ও বিশ্লেষকের মতামত তুলে ধরব, যেগুলো থেকে বোঝা যায় যে আমাদের সামনে যে ধ্বংসের আশঙ্কা রয়েছে, তা কতটা ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাময় হতে পারে। এসব বিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার বাস্তবে আমাদের নিজেদের সন্তানদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সমতুল্য।

আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মাইকেল হিগিন্স সতর্ক করে বলেছেন যে, আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি যা যুদ্ধের হুমকিতে পরিপূর্ণ–এমন এক সময়, যখন কূটনীতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে বিভেদ, উত্তেজনা এবং রক্তপাতকে উসকে দেওয়া হচ্ছে।

স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছেন যে, আজকাল মানুষ কোনো ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই অস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের কথা বলছে, যার ফলে বিশ্বে অস্থিরতা ও উদ্বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো, একজন মানুষ অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। এটি এমন এক স্বর্ণালী নীতি যে, যদি পৃথিবীর মানুষ তা অনুসরণ করত, তবে বিশ্ব সত্যিকার অর্থেই শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত হতে পারত।

জার্মানির চ্যান্সেলরও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরোধিতা করে বক্তব্য দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি যেমন যুদ্ধবিরোধী প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রশংসা করি, তেমনি জার্মান চ্যান্সেলরকেও সাধুবাদ জানাই। কিন্তু কেবল বক্তব্য প্রদানই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন বাস্তব পদক্ষেপ। নীতিগত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের দিকে তাকালে দেখা যায়, বাস্তব পদক্ষেপ প্রায় অনুপস্থিত।

পোপ লিও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইতোমধ্যেই ধীরে ধীরে সংঘটিত হচ্ছে।

আমি বলি, বাস্তবতা হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষেই চলছে; কিন্তু মানুষ এর ভয়াবহতা থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করার আশায় এ সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে।

অধিকন্তু, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, একটি অন্যায় বা অবৈধ কাজের প্রতিকার আরেকটি অন্যায় বা অবৈধ কাজের মাধ্যমে করা যায় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, ছোট ছোট যুদ্ধ ও সংঘর্ষ থেকেই বড় ও বিধ্বংসী যুদ্ধের সূচনা হয়। এমন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সতর্কতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। যদি এক পক্ষ অন্যায় করে, তবে তার অর্থ এই নয় যে অন্য পক্ষও অন্যায়ের পথ অবলম্বন করবে।

আজ বিশ্বের বড় শক্তিগুলো ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনকে উপেক্ষা করে ফেলেছে। তাদের দৃষ্টিতে তাদের নিজস্ব স্বার্থই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।"

সরকারগুলোর কাজ হলো জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করা। তাদের দায়িত্ব হলো এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যার ফলে নাগরিকদের জীবনমান উন্নত হয় এবং তাদের দৈনন্দিন জীবন আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকের শাসকদেরকে প্রায়ই এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করতে দেখা যায়–তারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যা মানুষের জীবনকে ক্রমশ আরও কঠিন ও দুর্বিষহ করে তুলছে। তারা যুদ্ধের আড়ালে নিজেদের ব্যর্থতাকে লুকানোর চেষ্টা করছে এবং এভাবে বিশ্বকে এক অন্তহীন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা মার্কিন চিন্তাবিদ মন্তব্য করেছেন যে, সাধারণভাবে পশ্চিমা বিশ্বে এবং বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক শক্তিকেই প্রায় প্রতিটি সমস্যার সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কূটনীতিকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে যুদ্ধকেই ক্রমবর্ধমানভাবে বিরোধ ও সংকটের সমাধান হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইরান–সম্পর্কিত যুদ্ধের বিষয়ে বলতে গেলে, এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পূর্বাভাস বহন করছে। প্রতিটি অন্যায় এবং প্রতিটি দ্বৈত নীতির পরিণতিতে অনিবার্যভাবেই ক্ষতিকর ফলাফল দেখা দেবে।

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত–উভয়েরই সাহায্য করা উচিত। ইসলাম প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে ফেলার শিক্ষা দেয়। যদি প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়ও, তবে তা কেবল সেই পরিমাণেই, যতটুকু অন্যায় সংঘটিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। যেমন লীগ অব নেশনস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি জাতিসংঘও একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মাত্র পাঁচটি দেশকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা নিজেই ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বর্তমানে শক্তিশালীদের জন্য এক ধরনের আইন এবং দুর্বলদের জন্য আরেক ধরনের আইন বিদ্যমান।

এমনকি মানবাধিকার সনদও এখন অনেকটাই কাগুজে কথায় পরিণত হয়েছে।

(শেষাংশ ৮ পাতায়....)

জুমআর খুতবা

"আল্লাহ তা'আলা চান যে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী সকল আত্মাকে-ইউরোপে হোক বা এশিয়ায়-যারা সৎ-প্রকৃতির অধিকারী, তাদের সবাইকে তাওহীদের দিকে আকৃষ্ট করুন এবং তাঁর বান্দাদের একক ধর্মের ওপর একত্রিত করুন। এটাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য, যার জন্য আমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ করো, তবে কোমলতা, উত্তম চরিত্র এবং দোয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে।"

(হযরত মসীহ মওউদ (আ.))

মানুষের সর্বদা এই চিন্তা রাখা উচিত যে, আমরা যে সকল নিয়ামত ও সন্তান-সন্ততি লাভ করেছি, তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই লাভ করেছি। আর এই বিষয়টি দাবি করে যে আমরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সামনে নত থাকব। আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর তাওহীদের প্রকাশ ঘটাব এবং আমাদের মধ্যে সামান্যতম শিরকের আভাসও যেন জন্ম না নেয়। কখনো এমন ধারণা করা উচিত নয় যে আল্লাহ তা'আলার ওপর আমাদের কোনো অধিকার রয়েছে। সামান্য কিছু ইবাদত করে আমরা তাঁর কোনো হক আদায় করে ফেলিনি; বরং আমরা নিজেদেরই কল্যাণের জন্য ইবাদত করি।

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যক্তিগত আবেগ ও উৎসাহ সৃষ্টি না হয় এবং মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনা ও পার্থিব লাভ-লোকসানের চিন্তা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো ইবাদত বা সদকা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না।"(হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

"আমি সর্বদা এই চিন্তায় মগ্ন থাকি যে কোনো না কোনোভাবে আমাদের এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সত্য-মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যাক। মৃত-মানবের উপাসনার এই ফিতনা আমার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে এবং আমার প্রাণকে এক অদ্ভুত কষ্টে ফেলে। এর চেয়ে বড় হৃদয়বিদারক বিষয় আর কী হতে পারে যে, এক অসহায় মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে এবং এক মুঠো মাটিকে রব্বুল আলামীন বলে মনে করা হয়েছে! আমি তো এই দুঃখে অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেতাম, যদি না আমার প্রভু, আমার সর্বশক্তিমান ও ক্ষমতাবান আল্লাহ আমাকে এই সান্ত্বনা দিতেন যে, শেষ পর্যন্ত তাওহীদেরই বিজয় হবে।" (হযরত মসীহ মওউদ (আ.))

"আমার সমস্ত আনন্দ এই বিষয়েই নিহিত এবং আমার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ এবং রাসূলে করীম (সা.)-এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।" (হযরত মসীহ মওউদ (আ.))

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করে বলেছেন:

"হে পারস্যের সন্তানগণ! তাওহীদকে আঁকড়ে ধরো, তাওহীদকে আঁকড়ে ধরো।"

এই ইলহামকে তাঁর বংশধরদের, বরং তাঁর প্রত্যেক অনুসারীর সামনে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য সর্বদা স্মরণে রাখা উচিত। তাঁর বায়আতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরও এটি সামনে রাখা উচিত। কারণ তাঁর বায়আতে এসে সবাই তাঁর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাঁর আধ্যাত্মিক পরিবারের সদস্য হয়েছে। যদি তারা তাওহীদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে, তবে তারা দীন ও দুনিয়ায় সম্মান লাভ করবে; অন্যথায় না রক্তের সম্পর্ক কোনো উপকার করবে, না শুধু বায়আত করাই কোনো উপকারে আসবে।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১০ এপ্রিল , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১০ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, নিজ মনিবের অনুসরণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তওহীদ (একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, তাঁর ব্যবহারিক আদর্শ আর নিজ অনুসারীদের প্রতি তাঁর উপদেশমালা এবং তিনি কীভাবে তাদের তরবিয়ত করতেন, সে সম্পর্কিত কিছু ঘটনা আমি উপস্থাপন করব।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলতেন, এক ব্যক্তির ছেলে মারা গিয়েছিল। তার এক বন্ধু সমবেদনা জানাতে তার কাছে গেলে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠে এবং তাকে বলে যে, খোদা আমার প্রতি বড় অবিচার করেছেন। ভাবটা এমন যেন আল্লাহ তা'লা তার কোনো অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) এরপর বলেন, ভেবে দেখা উচিত যে, এমন কী অধিকার আছে যা বান্দার আল্ল াহ তা'লা কাছে প্রাপ্য? আমার তো সবসময় এটি আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় যে, সেসব লোক, যারা নিজেদের নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার জন্য অহংকার করে, তারা তো কোনো কষ্টের সময় চিৎকার করে ওঠে যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছেন। কিন্তু ভারতের সেই মদ্যপায়ী কবি, যে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিল, মদে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও সত্যসচেতনতার এক মুহূর্তে আল্লাহ তা'লার ইলহাম তার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং সে বলে ওঠে যে:

জাঁ দি হুই উসি কি থি/ সাচ তো ইয়েহ হ্যায় কি হক আদা না হুয়া।

(প্রাণ দিয়েছি কিন্তু বাস্তবে এ প্রাণ তো তাঁরই দেওয়া, সত্য সত্যকথা হল তাঁর কৃতজ্ঞতার দাবি পূরণ করা হয়নি।)

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১২, পৃ: ৩১১-৩১২)

অতএব মানুষের সবসময় এই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যে নেয়ামত ও যে সন্তান-সন্ততি আমরা লাভ করেছি তা আল্লাহ তা'লার কৃপাতেই লাভ করেছি এবং এই বিষয়টির দাবি হল, আমাদের সর্বদা আল্লাহ তা'লার সম্মুখে বিনত থাকা, নিজেদের প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর তওহীদের প্র কাশ ঘটানো। আমাদের মাঝে যেন শিরক-এর লেশমাত্রও না থাকে। আমরা যেন কখনো এটি মনে না করি যে, আল্লাহ তা'লার ওপর আমাদের কোনো অধিকার রয়েছে। সামান্য ইবাদত করার মাধ্যমেই কোনো হক বা অধিকার আদায় হয়ে যায় না বরং আমরা নিজেদের কল্যাণার্থেই তা করে থাকি।

অতএব, যে কবির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সে তো এটাই বলে যে, জীবন আল্লাহ তা'লাই দিয়েছেন, এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি, কিন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতার যে দায়িত্ব আমাদের পালন করা উচিত, তা পালন করার সাধ্য আমাদের নেই। একইভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিজের এক পুত্রের ইন্তেকালে তাঁর প্রতিক্রিয়ার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে: মুবারক আহমদ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ছোট ছেলে ছিলেন।

মুবারক আহমদের প্রতি তাঁর (আ.) অগাধ ভালোবাসা ছিল এবং তার অসুস্থতার সময় তিনি (আ.) অনেক সেবা-যত্ন করেছেন। এর ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এরও ধারণা ছিল যে, যদি মুবারক আহমদ মারা যায় তবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খুবই আঘাত পাবেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হযরত মৌলবী সাহেব (খলীফা আউয়াল) তার নাড়ি দেখছিলেন, তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে তিনি কস্তুরী আনতে বলেন।

তার নাড়ি বন্ধ হয়ে আসছিল। এই চিন্তায় যে তার মৃত্যুতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনেক কষ্ট হবে, তাঁর [অর্থাৎ হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর] ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই মাটিতে পড়ে যান! কিন্তু যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জানতে পারেন যে, মুবারক আহমদ মারা গেছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বন্ধুদের কাছে পত্র লেখা আরম্ভ করেন যে, মুবারক আহমদ মারা গেছে, তবে এই বিষয়ে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। এটি আল্লাহ তা'লার একটি ইচ্ছা ছিল, যাতে আমাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত। আর এরপর বাইরে এসে হাসিমুখে তিনি (আ.) বক্তব্য রাখেন যে, মুবারক আহমদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার যে ইলহাম ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি কবিতাও রয়েছে যে:

'বুলানে ওয়ালা হ্যায় সব সে পেয়ারা/ উসি পে এ্যায়ে দিল তু জাঁ ফিদা কর।'

(যিনি ফেরত নিয়েছেন তিনিই সবচেয়ে প্রিয়, হে হৃদয়! তাঁরই জন্য তুমি প্রাণ উৎসর্গ করো।) (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-৭, পৃ: ৬৫-৬৬)

একইভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে একটি কথা আমি বারবার শুনেছি। তিনি তুরস্কের ক্ষমতাচ্যুত সুলতান আবদুল হামিদ খানের কথা উল্লেখ করে বলতেন যে, সুলতান আবদুল হামিদ খানের একটি কথা আমার কাছে খুবই প্রিয়। যদিও তার অনেক কথাই ভুল ছিল, কিন্তু তিনি (আ.) বলতেন যে, এই কথাটি আমার খুব পছন্দ। সেটা কী? তা হল, যখন গ্রিসের সাথে যুদ্ধের প্রশ্ন আসে, তখন মন্ত্রীরা অনেক অজুহাত উপস্থাপন করে। আসলে সুলতান আবদুল হামিদ চাইতেন যে যুদ্ধ হোক, কিন্তু মন্ত্রীদের ইচ্ছা ছিল না, তাই তারা নানা অজুহাত উপস্থাপন করে। অবশেষে তারা বলে, যুদ্ধের জন্য এই জিনিসটিও প্রস্তুত এবং ওটাও প্রস্তুত, কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কথা উল্লেখ করে বলে দেয় যে, অমুক বিষয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ, ঠিক আছে, আমরা প্রস্তুত, কিন্তু এই ঘাটতি রয়েছে এবং এই ঘাটতির কারণে যুদ্ধ করা অনেক কঠিন। উদাহরণস্বরূপ তারা বলেছিল এবং সম্ভবত এটাই বলে থাকবে যে, সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি এই মুহূর্তে গ্রিসকে সাহায্য করার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আর আমাদের কাছে কোনো প্রতিকার নেই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলতেন যে, যখন মন্ত্রীরা তাদের পরামর্শ দেয় আর সমস্যার কথা জানায় এবং বলে যে, অমুক জিনিসের ব্যবস্থা নেই, তখন সুলতান আবদুল হামিদ উত্তর দেন যে, কোন কাজ খোদার জন্যও রেখে দেয়া উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সুলতান আবদুল হামিদের এই বাক্য খুবই উপভোগ করতেন এবং বলতেন, তার এই কথাটি আমার খুবই পছন্দনীয় যে, সে খোদার ওপর ভরসা করেছে। (তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৬৩-১৬৪)

তওহীদের ব্যাপারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমানের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন যে, মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কাপুরথলভী আমার কাছে লিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাথা ঘোরার রোগ ছিল। তাঁর মাথা ঘোরার কষ্ট ছিল। এক চিকিৎসক সম্পর্কে শোনা যায় যে, তিনি এতে বিশেষ দক্ষতা রাখেন। মা থা ঘোরা রোগের চিকিৎসায় তিনি খুব পারদর্শী, তাই তাকে ডাকা হয়। তাকে ভাড়া পাঠানো হয় এবং পথখরচ দিয়ে অনেক দূর থেকে ডাকা হয়। সে হুযূরকে দেখে বলে যে এটি এমন কোনো ব্যাপারই না দুই দিনের মধ্যে আমি আপনাকে সুস্থ করে দেব। এ কথা শুনে হযরত সাহেব (আ.) ভেতরে চলে যান এবং হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে এ মর্মে একটি চিরকুট লিখেন পাঠান যে, এই ব্যক্তির কাছ থেকে আমি কখনোই চিকিৎসা করাতে চাই না। সে কি খোদা হওয়ার দাবি করে? তার ভাড়ার অর্থ এবং অতিরিক্ত পঁচিশ রুপি পাঠিয়ে বলেন তাকে দিয়ে বিদায় করে দিন আর তা-ই করা হয়। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

একইভাবে হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, খোদা তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর মাহ াত্ম্য ও সম্মানের জন্য গভীর ভাবানুরাগ রাখেন। এমন লোকেরা একটি সূক্ষ্ম পথে চলেন আর প্রত্যেক যায়েদ বা বকর তাদের সাথে (তাল মিলিয়ে) চলতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার জন্য ভালোবাসার আবেগ-উচ্ছ্বাস না থাকবে, মানুষের কোন আনন্দ লাভ হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার জন্য ভালোবাসার ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাস না থাকবে এবং প্রবৃত্তির চাওয়া-পাওয়া এবং নিজের পার্থিব স্বার্থের উর্ধ্বে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো ইবাদত ও সদকা গৃহীত হয় না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির কলুষ এবং জাগতিক লাভ-লোকসানের ধান্দা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য ন্ত তার কোনো ইবাদত এবং সদকা গৃহীত হয় না। যে ব্যক্তি খোদার জন্য ভালোবাসার আবেগ রাখে, সে (পুণ্যে) তার সমগোত্রীয়দের ছাড়িয়ে যায়; এমন লোকেরা খোদার নিকট থেকে কল্যাণরাজি লাভ করে।"

(যিকরে হাবীব, প্রণেতা- হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব, পৃ: ১৮২)

অতএব, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তৌহীদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং ঈমান থাকাও আবশ্যক। আর আল্লাহ্ তা'লার সমীপে তাঁর ভালোবাসা লাভের জন্য সর্বাগ্রে দোয়া করতে হবে। যারা লেখেন, 'আমরা অনেক দোয়া করেছি, আমরা এটা করেছি, ওটা করেছি, নফল পড়েছি, সদকা দিয়েছি, কিন্তু আমাদের দোয়া গৃহীত হয় নি', তাদেরবিষয়টি একটু ভেবে দেখা উচিত। এই ব্যবস্থাপত্র হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাতলে দিয়েছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন: খোদাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভালোবাসাকে এতটা মূল্যায়ন করেছেন, যা কেবল তাঁরই সীমাহীন দয়া এবং তাঁর অনন্য গুণগ্রাহীতার সাথে মানানসই বৈকি। যেমন তাঁকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

:اَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِیْدِیْ وَ تَفْرِیْدِیْ۔ اَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِیْ۔ اِنِّیْ مَعَكَ یَا ابْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ...

অর্থাৎ, যেহেতু এযুগে তুমি আমার তৌহীদের পতাকাবাহী এবং পৃথিবীতে তৌহীদের হারানো সম্পদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করছ, তাই হে মুহাম্মদী মসীহ্! তুমি আমার কাছে ততটাই প্রিয় যতটা আমার তৌহীদ ও তাফরীদ (তথা আমার একত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যতা)। আর খ্রিষ্টানরা যেহেতু মিথ্যা এবং অপবাদমূলকভাবে তাদের মসীহ্‌কে খোদার দৈহিক পুত্র বানিয়ে বসেছে, তাই আমার আত্মমর্যাদাবোধ দাবি, আমি যেন তোমাকে সেভাবে ভালোবাসি যা সন্তানের প্রাপ্য হয়ে থাকে, যাতে বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিষ্যও 'আতফালুল্লাহ্' (বা আল্লাহ্‌র সন্তানতুল্য) হওয়ার মর্যাদায় উপনীত হতে পারে। আর যেহেতু তুমি আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ধর্মে র সেবায় অহোরাত্র নিমগ্ন এবং তাঁর ভালোবাসায় বিভোর, তাই আমি তোমাকে আমার সেই প্রিয়ভাজনের আধ্যাত্মিক সন্তান হিসেবে আমার অমর ভালোবাসা এবং আমার চিরন্তন সাহচর্যে র পদ'কে ভূষিত করছি।" (সীরতে তৈয়্যবা, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, পৃ: ১৩-১৪)

এটি হল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ উক্ত এলহামের অর্থ, যা আমি এখনই পড়লাম।

তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কেই মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এক স্থানে লেখেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল, ইসলামের সেবা এবং তৌহীদ প্রতিষ্ঠা। আর সেই যুগে খাঁটি তৌহীদের সবচেয়ে বড়ো মোকাবিলা খ্রিষ্টবাদের সাথেই ছিল। আজও কোনো কোনো অঞ্চলে রয়েছে তৌহীদের ছদ্মাবরণে ভয়ানক শিরকের শিক্ষা দেয় এবং হযরত মসীহ্ নাসেরীকে, নাঊযুবিল্লাহ্, খোদার পুত্র সাব্যস্ত করে হযরতে আহদীয়্যত (তথা এক ও অদ্বিতীয়) খোদার পাশে বসায়। এজন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে প্রবল উচ্ছ্বাস ছিল আর এমনিতেও মসীহ্ হিসেবে পদাধিকার বলে তাঁর প্রধান দায়িত্বও বিভিন্ন হাদীসে 'কাসরে সলীব' (তথা ক্রুশ ভঞ্জকারী) বলেই বর্ণিত হয়েছে। তাই তিনি হযরত ঈসা (আ.) -এর মৃত্যুর ওপর অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করতেন। কারণ, শুধুমাত্র এই একটি বিষয় সাব্যস্ত হলেই খ্রিষ্টধর্মের কবর রচিত হয়। অর্থাৎ, ঈসার মৃত্যুর ফলে তাঁর ঈশ্বরত্ব টিকে থাকে না এবং ত্রিত্ববাদের নাম-চিহ্নও মিটে যায়, আর কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসও স্বীয় নড়বড়ে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। নিঃসন্দেহে মসীহ্ নাসেরীর মৃত্যুর বিশ্বাস স্বভাবতই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের সত্যতা প্রমাণের প্রথম সোপান কিন্তু এ বিষয়ের প্রকৃত গুরুত্ব, যে কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এত বেশি গুরুত্বারোপ করতেন, তা বর্তমান খ্রিষ্টবাদের 'খণ্ডন'। একে খণ্ডন করার সাথে সম্পর্ক রাখে।

যেমন, তিনি প্রায়শই বলতেন, তোমরা ঈসাকে মরতে দাও, কেননা এতেই ইসলামের জীবন নিহিত। হায়! আমাদের অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরা যদি এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন করে কমপক্ষে খ্রিষ্টবাদের মোকাবিলায়

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

আমাদের সাথে একমত হতো? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি মানা বা না মানা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু এটি তো অন্তত মেনে নিক; যা দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়। খিষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং এ যুগে সেসব

বিশ্বাসের বিশ্বজুড়ে প্রসারের বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে এত ভারী বোঝা হিসেবে চেপে বসেছিল যে, তিনি এক স্থানে ব্যথা ও বেদনায় জর্জরিত হয়ে অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন,

"আমি সর্বক্ষণ এই চিন্তায় মগ্ন থাকি যে, কোনো না কোনোভাবে আমাদের এবং খ্রিষ্টানদের) মাঝে মিমাংসা হয়ে যাক। মৃতপূজার অনিষ্টে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় এবং আমার প্রাণ অদ্ভুত এক কষ্টে জর্জরিত হয়। এটি অপেক্ষা অধিক আর কোন্ মর্মযাতনা যে, একজন অধম মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে এবং এক মুষ্টি ধূলিকে বিশ্বপ্রতিপালক জ্ঞান করা হয়েছে। যদি আমার মনিব এবং আমার সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে আশ্বস্ত না করতেন যে, চূড়ান্ত বিজয় তৌহীদেরই হবে তাহলে আমি কবেই না এই বেদনায় ধ্বংস হয়ে যেতাম।"

(সীরাতে তৈয়্যবা, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, পৃ: ১০৬-১০৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে অবগত এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বোত্তম সাক্ষী যে, তাঁর পথে আমাকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি দান করা হয়েছে, তা হল 'কালবে সালীম' বা নিষ্কলুষ হৃদয়। অর্থাৎ, এমন এক হৃদয়, যার সত্যিকার সম্পর্ক মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সাথেই ছিল না। আমি এক সময় যুবক ছিলাম এবং এখন বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমার জীবনের কোনো কালেই মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা ব্যতীত অন্য কারো সাথে আমার প্রকৃত সম্পর্ক খুঁজে পাই নি। ভালোবাসার এই উত্তাপের কারণেই আমি কখনো এমন কোনো ধর্মে সন্তুষ্ট হতে পারি নি, যার বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ও একত্ববাদের পরিপন্থী ছিল অথবা যার অপরিহার্য ফলাফল হল তাঁর অবমাননা। এ কারণেই, খ্রিষ্টধর্ম আমার পছন্দ হয় নি, কেননা এর প্রতিটি ধাপে মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদার অবমাননা রয়েছে। একজন দুর্বল মানুষ, যে নিজ-প্রাণকেও সাহায্য করতে পারে নি, (অথচ) তাকেই খোদার আসনে বসানো হয়েছে।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৯-৬০)

হযরত মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন,আমার ঘরে পর পর দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। [তিনি যখন এই ঘটনা বর্ণনা করেন তখন খোদার কৃপায় তারা জীবিত ছিল।] এরপর এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে, যে মূক ও বধির ছিল। প্রথম ছেলেটি প্রায় সময় অসুস্থ থাকত, কিন্তু দ্বিতীয় ছেলে বুদ্ধিমান ও সুস্থ ছিল। তার স্বভাব ও চেহারা-সুরত এতই মনোহর ছিল যে, ছোটো বয়সেই সে বাড়ির সব কাজকর্ম করত এবং সামান্য ইঙ্গিতেই কথা বুঝে যেতো। সে খুবই বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত মেধাবী ছিল। এসব কারণে তার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। প্রথম ছেলেটি, যে অসুস্থ ছিল, চার বছর বয়সে মারা যায়। আর দ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছেলেটির বয়স যখন সাড়ে চার বছর হয়, তখন তার টাইফয়েড হয়। আমি অনেক চিকিৎসা করাই, কিন্তু আরোগ্যের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তার অসুস্থতার পনেরো দিন পার হলে সে 'সারসাম' তথা মেনিনজাইটিসের ন্যায় রোগে আক্রান্ত হয়। [এতে মস্তিষ্কের ঝিল্লিতে প্রদাহ দেখা দেয় বা ফুলে যায় এটিকে সারসাম বলে।] আমি হযরত সাহেব (আ.)-এর সমীপে দোয়ার জন্য একটি পত্র লিখি যে, 'সে আমার খুবই আদরের সন্তান। তার জন্য দোয়া করুন যেন সে বেঁচে যায়।' তিনি (আ.) এর উত্তরে লিখেন:"আমি দোয়া করব, ইনশাআল্লাহ্! কিন্তু যদি তকদীরে মুবরাম (অমোঘ তকদীর) হয়ে থাকে তা টলতে পারে না।" সাথে এটিও লিখে দেন। এটি পড়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, এই শিশু বাঁচবে না। চতুর্থদিন তার অবস্থা আরো আশঙ্কাজনক ছিল এবং হুযূর (আ.) সেদিন গুরুদাসপুর মামলার শুনানিতে যাচ্ছিলেন। যেহেতু আমি প্রতিটি শুনানির দিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে যেতাম, তাই আমিও যাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়ে গেলাম। যখন তিনি (আ.) ঘর থেকে বের হলেন তখন প্রথমে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার সন্তান কেমন আছে? আমি নিবেদন করলাম, হুযূর! আমার সাথে চলুন, গিয়ে দেখুন অবস্থা খুব শোচনীয়-ঘর সাথেই ছিল। তিনি ঘরে এসে ছেলেকে দেখে বললেন, এ তো খুবই অসুস্থ, তুমি আজকে গুরুদাসপুর যেও না, আজ তুমি আমাদের সাথে যেও না। তিনি নিজের সফরে রওনা হয়ে গেলেন এবং পরদিন চার ঘটিকায় বাচ্চা মারা গেল। এর পরদিন সকাল দশটায় হুযূর (আ.) গুরুদাসপুর থেকে ফেরত আসলেন। আমি শুনে করমর্দন করার জন্য অগ্রসর হলাম, আমার কোলে আমার ছোট মেয়ে ছিল যে সেই পুত্রের চেয়ে ছোট ছিল। আমাকে দেখে হুযূর (আ.) বললেন, তোমার বাচ্চার মৃত্যুতে আমি খুবই দুঃখভারাক্রান্ত। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, তার সাথে তোমার ভালোবাসা শিরকের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, এজন্য তার জীবিত থাকা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। যাহোক আমি তোমার সন্তানের জন্য অনেক দোয়া করেছি। আল্লাহ্ তোমাকে এর চেয়ে উত্তম সন্তান দান করবেন, আর সে শ্রবণশক্তির অধিকারী হবে ও কথা বলবে। নতুন সন্তান দিবেন, যে শুনার ও বলার ক্ষমতা রাখবে, সুস্থ-সবল হবে। তিনি বলেন, এরপর ফযল করীম জন্ম নিল। এরপর আব্দুল হাফিয জন্ম নিল, এরপর দুই ছেলে গর্ভপাতে নষ্ট হল। যাইহোক দুই সন্তান জীবিত জন্ম নিল। এরপর এক পুত্র জন্ম নিল, অতঃপর আব্দুল্লাহ ও আব্দুল করীম জন্ম নিল। এরপর আহমদ জন্ম নিল। খোদার কৃপায় পাঁচজন সন্তান জীবিত জন্ম নিল। আল্লাহ্র কৃপায় সবাই জীবিত আর দীর্ঘায়ু পেয়েছে। মোটকথা, তিনি নিজ সাহাবীদেরও সর্বদা তওহীদের পাঠ দিতেন। এরপর তাদের মনোস্তুষ্টির জন্য দোয়াও করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ করে পাঁচজন পুত্র সন্তান দিয়েছেন।

(সীরাতে আহমদ, প্রণেতা- কুদরাতুল্লাহ সানোরি, পৃ: ১৬৮-১৭০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জনবসতিতে বসবাসকারী সব সাধুপ্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং তাঁর বান্দাদের একই ধর্মে সমবেত করতে চান। এটাই খোদাতা'লার অভিপ্রায় যে উদ্দেশ্যে আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। অতএব তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু কোমলতা, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে। (আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা-৭, বাংলা সংস্করণ, মে ২০২৩)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আমার সমূহ আনন্দ এতেই এবং আমার আবির্ভাবের আসল উদ্দেশ্য এটিই যে, খোদা তা'লার তওহীদ এবং মহানবী (সা.)-এর সম্মান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫)

হযরত পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বলেন, পীরাদাত্তা নামের হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একজন সেবক ছিল। আমরা সবাই তাকে এই নামেই ডাকতাম। কিন্তু হুযূর (আ.) যখন তাকে ডাকতেন পীরাঁ দীত্তা বলতেন। পীরা দাত্তা নয় বরং পীরাঁ দাত্তা। অর্থাৎ, আল্লাহ্র দেওয়া আমার পীর। এটি সেই তওহীদ যেটি সম্পর্কে হুযূর (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'খুযুত তওহীদা, আত-তওহীদা ইয়া আবনাআল ফারেস!'

অর্থ: হে পারস্যের বংশধর! তওহীদকে আঁকড়ে ধর, তওহীদকে আঁকড়ে ধর। (ইর্ফাতিখারুল হক ইয়া ইনামাতে খুদাওয়ান্দি, পৃ: ২২৯)

অতএব এই ইলহাম নিজ স্থায়ীত্ব ও বংশধারার উন্নতির জন্য তাঁর বংশধর বরং প্রত্যেক মান্যকারীকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। প্রত্যেক বয়আতকারীকে সম্মুখে রাখা উচিত। তাঁর বয়আত করার পর সবাই তাঁর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। যদি একে অর্থাৎ একত্ববাদকে আঁ কড়ে থাকেন তাহলে দ্বীন ও দুনিয়া তথা পার্থিব ও আধ্যাত্মিকউভয় ক্ষেত্রেই সম্মান লাভ করবে; নতুবা না রক্তের সম্পর্ক কোন কাজে আসে, না কেবল বয়আত করায় কোন লাভ হয়।

হাফেয মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "প্রথমবার যখন আমি, হাকীম আব্দুল আযীয ও হাকীম আতা মুহাম্মদ সাহেব- হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হই, সে সময় হুযূর (আ.) গুরুদাসপুরে অবস্থান করছিলেন; হুযূর ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন আমরা তিনজনই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমি এবং হাকীম আব্দুল আযীয সাহেব হুযূরকে আস-সালামু আলাইকুম বলে করমর্দন করি; কিন্তু ভাই আতা মুহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। হুযূর তাকে হাত ধরে উঠান এবং বলেন, "আল্লাহ তা'লা আমাকে এই যুগে এই শিরককে দূর করার জন্যই তো প্রেরণ করেছেন। পায়ে চুমু দেওয়া শিরক। এরপর তিনি (আ.) তার সাথেও করমর্দন করেন। " (রেওয়ায়াত আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭২)

অনুরূপভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন,

"কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশোয়ারী সাহেব পত্রযোগে আমাকে অবগত করেন যে, প্রাথমিক দিনগুলোতে আমি যখন কাদিয়ান যাই তখন এক ব্যক্তি তার ছেলেকে হযরত সাহেবের সামনে সাক্ষাৎ করার জন্য সামনে পাঠায়। যখন সেই ছেলে হযরত সাহেবের সাথে করমর্দ ন করার জন্য সামনে এগিয়ে আসে তখন সম্মান প্রদর্শনার্থে হুযূরের পায়ে হাত বুলাতে শুরু করে। এতে হুযূর (আ.) তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা এরূপ করতে বাধা দেন এবং আমি দেখি যে, তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে এবং তিনি (আ.) অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,

"নবীরা পৃথিবীতে শিরক দূর করার জন্য আসেন এবং আমার কাজও শিরক দূর করা, শিরক প্রতিষ্ঠা করা নয়।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমি এই বিষয়ের কঠোর বিরোধী যে, কেউ আমার ছবি তুলবে। ছবি সম্পর্কেও এখানে ব্যাখ্যা এসে যায়। অনেক মানুষ অপছন্দনীয়ভাবে নিজের, মসীহ মওউদ (আ.)-এর এবং নিজ প্রিয় আত্মীয়-স্বজনদেরও ছবি রেখে থাকে, এজন্য আমি এ বিষয়টি বর্ণনা করছি। তিনি (আ.) বলেন, আমি এই বিষয়ের কঠোর বিরোধী যে, কেউ আমার ছবি তুলবে এবং এটিকে মূর্তিপূজারীদের ন্যায় নিজের কাছে রাখবে বা প্রচার করবে। আমি কখনো এমন নির্দেশ প্রদান করি নি যে, কেউ এরূপ করুক। আর কেউ আমার চেয়ে বেশি মূর্তিপূজা ও ছবিপূজার শত্রু হবে না। কিন্তু আমি দেখেছি আজকাল ইউরোপের লোকেরা যদি কোনো ব্যক্তির রচনা পড়তে চায় তাহলে সর্বপ্রথম তারা তার ছবি দেখার আকাঙ্ক্ষী হয়। কেননা ইউরোপে মানুষের স্বভাব ও চরিত্র বোঝার বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়েছে এবং

তাদের অধিকাংশ কেবল ছবি দেখেই চিহ্নিত করতে পারে যে, এরূপ দাবিকারক সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। আর তারা হাজার ক্রোশ অতিক্রম করে না আমার কাছে আসতে পারে না আর আমার চেহারা দেখতে পারে না। তাই সে সকল দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ছবির মাধ্যমে আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে।

এমন অনেক লোক আছে যারা ইউরোপ অথবা আমেরিকা থেকে আমার নিকট চিঠি লিখেছে, পত্র লিখেছে এবং তাদের চিঠিতে লিখেছে যে, আমরা আপনার ছবি গভীরভাবে দেখেছি এবং ইলমে ফিরাসাত বা Science of Physiognomy (মানুষের বাহ্যিক রূপ, শারীরিক গঠন বা লক্ষণ দেখে তার অভ্যন্তরীণ চরিত্র, ব্যক্তিত্ব বা ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান করার বিদ্যা বা জ্ঞান)-এর মাধ্যমে আমরা মানতে বাধ্য হয়েছি যে, এটি যার ছবি সে মিথ্যাবাদী নয়, মিথ্যাবাদী হতে পারে না। একজন আমেরিকান নারী আমার ছবি দেখে বলে যে, এটি যীশু অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর ছবি। অতএব, এই উদ্দেশ্যে এবং এই সীমা পর্য ন্তই আমি এই রীতি অবলম্বনের বিষয়ে আমি নীরব ছিলাম। এজন্য আমি ছবি উঠানোর অনুমতি প্রদান করেছি; নতুবা যদি শিরকের বিস্তার ঘটে তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ওয়া ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত (অর্থাৎ কাজের ফলাফল নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল)। আর আমার বিশ্বাস এটি নয় যে, ছবি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; আমি এটিও বলছি না যে, ছবি উঠানো হারাম কাজ। কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, জ্বিন জাতি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য ছবি বানাতো এবং বনী ইস্রাঈলের নিকট দীর্ঘকাল ধরে নবীদের ছবি ছিল। বনী ইসরাঈলের কাছে নবীদের যে-সকল ছবি ছিল সেগুলোর মাঝে মহানবী (সা.)-এর ছবিও ছিল। জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে একটি রেশমী কাপড়ে হযরত আয়েশা (রা.)'র ছবি দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও জলাশয়ে কতক পাথরের ওপর প্রাণীদের চিত্র প্রাকৃতিকভাবে খোদিত হয়ে যায়। ভূমিকম্পের কারণে পাহাড়ে বিভিন্ন প্রাণী ছাপা পড়লে সেগুলোর ছবি চিত্রি হয়ে যায়। যে যন্ত্রে র মাধ্যমে বর্ত মানে ছবি তোলা হয়, অর্থাৎ ক্যামেরা, তা মহানবী (সা.)-এর যুগে আবিষ্কৃত হয় নি আর এটি খুবই আবশ্যকীয় যন্ত্র যার মাধ্যমে কতক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। অতএব শুধুমাত্রছবির বিষয় নয় বরং তিনি (আ.) বলেন, এর মাধ্যমে রোগসমূহ নির্ণয় করাও সম্ভ ব হয়। বর্তমানে এই প্র যুক্তি আরো উন্নতি সাধন করেছে। সেই যুগে এক্স-রে ছিল। তিনি (আ.) বলেন, ছবি তোলার জন্য আরো একটি যন্ত্র আবিষ্কৃতহয়েছে যার মাধ্যমে মানুষের সমস্ত হাড়ের ছবি তোলা হয় এক্স-রে'র মাধ্যমে। অস্থিসন্ধির ব্যাথা ও গেঁটেবাত প্রভৃতি রোগ নির্ণয়ে এই যন্ত্রে র মাধ্যমে ছবি তোলা হয় এবং রোগের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। [এখন তো স্ক্যানিং, এম.আর.আই. প্রভৃতি বরং অনেক কিছু হয়ে থাকে।] অতএব সেই যুগে এই যন্ত্রসমূহের যতটুকু ব্যবহার ছিল তিনি (আ.) তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, এটি খুবই উপকারী যন্ত্র, তাই এটি বলা যে, এর সামনে মোটেও যাবে না-এটি ভুল। উদ্দেশ্য পুণ্য হওয়া উচিত। ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত। এরূপ হলে ঠিক আছে, এটি বৈধ। শিরক হওয়া উচিত নয়। তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে ছবির মাধ্যমে জ্ঞানের অনেক কল্যাণকর দিক উন্মোচিত হয়েছে। সাধারণ স্থিরচিত্রের, মাধ্যমে অনেক ইংরেজ পৃথিবীর সকল প্রাণীর, এমনকি বিভিন্ন প্রকার পঙ্গাপালের ছবি এবং নানান প্রকার পশুপাখির ছবি নিজেদের পুস্তকে ছাপিয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন চ্যানেলেও রয়েছে, যেমন, National Geographic বা এমন আরো চ্যানেল আছে, এরা তো ছবি তুলে প্রাণীকুলের বিস্তারিত বিবরণও উপস্থাপন করে থাকে। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, এর মাধ্যমে জ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়েছে। অতএব, এটি কি ধারণা করা যেতে পারে যে, সেই খোদা যিনি জ্ঞানের প্রেরণা জোগান, তিনি এমন যন্ত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করবেন যার মাধ্যমে বড়ো বড়ো জটিল রোগসমূহ নির্ণিত হয় এবং মুখমণ্ডলবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের সঠিকপথ প্রাপ্তির একটি মাধ্যম হয়। এগুলো সব অজ্ঞতা যা প্রসার লাভ করেছে। ছবিকে হারাম বলা, নিষিদ্ধ বলা এটিও ভুল। তবে, হ্যাঁ, উদ্দেশ্য পুণ্য হতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের দেশের মৌলবীরা বাদশাহর চেহারা খচিত টাকা, দুই আনা, চার আনা এবং আট আনা নিজের পকেট থেকে আর ঘর থেকে কেন বাইরে ছুঁড়ে ফেলে না? এই মৌলবীরা যদি এতটাই চরমপন্থী হয়, তবে আমাদের যে কোয়েন তথা পয়সা, টাকার নোট আছে যেগুলোর ওপর বাদশাহদের ছবি অঙ্কিত থাকে, তারা কেন সেগুলো ঘর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে না? কেন নিজেদের পকেটে বহন করে বেড়ায়? এই পয়সাগুলোর ওপরে কি ছবি নাই? পরিতাপ! এই লোকেরা অন্যায়ভাবে অযৌক্তিক কথা বলে বিরোধীদের ইসলামের ওপর হাসি-ঠাট্টা করার সুযোগ করে দেয়। ইসলাম সকল অনর্থক কাজ এবং এমন কাজ যা শিরক বা পৌত্তলিকতাকে সমর্থন হারাম করেছে। এমন কাজকে নয় যা মানুষের জ্ঞানের প্রসার করে এবং রোগনির্ণয়ে সহায়ক হয় এবং বিচক্ষণ লোকদের হিদায়াতের নিকটবর্তী করে দেয়।

কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও আমি ঘৃণাক্ষরেও এটি পছন্দ করি না যে, আমার জামা'তের সদস্যরা, এমন প্রয়োজন ব্যতীত যা বাধ্য করে, তারা আমার ছবিকে ঢালাওভাবে প্রকাশ করা নিজের উপার্জনের মাধ্যম এবং পেশা বানিয়ে নিবে। পুণ্য উদ্দেশ্য হলে ঠিক আছে। ছবি (ছাপানোকে) উপার্জনের মাধ্যম বানিও না। কেননা এভাবে ধীরে ধীরে বিদ'আত সৃষ্টি হয় এবং (পরিশেষে) শিরক পর্যন্ত পোঁছে যায়। তাই আমি আমার জামা'তকে এ স্থানেও উপদেশ দিচ্ছি যে, যতটুকু তাদের পক্ষে সম্ভব এমন কাজ থেকে যেন বিরত থাকুন।

অনেক ব্যক্তির কাছে আমি এমন কার্ডও দেখেছি যার পিছন দিকে এক পাশে আমার ছবি রয়েছে। আমি এমন ধরনের ছাপার ঘোর বিরোধী আর আমার জামা'তের কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করুক- আমি তা চাই না। কোনো সঠিক এবং উপকারী বা কল্যাণকর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা এক বিষয় আর হিন্দুদের মতো যারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ছবি যত্রতত্র ঘরদোরে ঝুলিয়ে রাখে, তা ভিন্ন বিষয়। সর্বদা এটিই পরিলক্ষিত হয় যে, এমন অনর্থক কাজ শিরকে পর্যবসিত হয়ে থাকে এবং সেগুলো থেকে বড় বড় অনিষ্ট দেখা দেয়, যেভাবে হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি আশা রাখি, যে ব্যক্তি আমার উপদেশমালাকে গুরুত্ব ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে আর আমার প্রকৃত অনুসারী, সে এই নির্দেশের পর এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে নতুবা সে আমার নির্দেশনার বিপরীতে নিজেকে পরিচালিত করবে এবং শরিয়ত নির্ধারিত পথে অসম্মানজনকভাবে পদচারণা করে। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ৩৬৫-৩৬৭)

অতএব অনেক গুরুত্বের সাথে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, আমাদের ছবি টাঙানোর উদ্দেশ্য কী? কোনোভাবেই এই উদ্দেশ্যে যেন শিরকে পর্যবসিত না হয়। ছবি বা প্রতিকৃতিসমূহকে সালাম করা এবং সেগুলোর সম্মুখে অবনত হওয়া সব শিরকপ্রসূত ধ্যানধারণা।

হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই এমনটি করে থাকেন অর্থাৎ তারা তাদের মৃত ব্যক্তির পুরোনো কোনো ছবি টাঙিয়ে দেয় এবং সেই ছবির উপর ফুলের মালাও চড়িয়ে দেয়।

কেউ কেউ তার মৃত প্রিয় ব্যক্তিদের ছবি বানিয়ে, এখানে আমাদের ভিতরেও এখন কোনো কোনো জায়গায় এমন রীতি হয়ে গেছে যে, তারা তাদের মৃত ব্যক্তিদের ছবি বানিয়ে নিজেদের গ্রুপ ছবির সাথে একটি বড় ফ্রেমে একসাথে বাঁধিয়ে রাখে আর বলে যে, এই হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের ছবি যারা মৃত্যু বরণ করেছেন, তারাও আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন।

অতএব এ সবই হচ্ছে শির্ক। তিনি (আ.) বলেন, এগুলো ভ্রান্ত বিষয় এবং বিদআত, এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। অনেক সময় আমার কাছে রিপোর্ট আসে যে, অনেকে নিজেদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবিও এভাবে উঠিয়ে থাকেন। শুধুমাত্র ভালো উদ্দেশ্যে অথবা নিজেদের স্মৃতিচিহ্নের উদ্দেশ্যে নিজেদের ছবির এ্যালবামে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ছবি উঠিয়ে থাকেন তাহলে সেটিতো বৈধ কিন্তু এটিকে একটি বিদআত বানিয়ে ফেলা এবং সেই ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে সেটিকে দেখা এবং সকালে উঠে সেটিকে সালাম করা, এগুলো ভ্রান্ত কাজ যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।

হযরত সুফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের কতক ব্যক্তি এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল যে, আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্র দাবীকারকের ছবি দেখতে চাই, এজন্যই হুযুরের ছবি তোলা হয়েছিল। সেখানে আব্দুল মুহী নামের এক আরব ব্যক্তি ছিলেন, তিনি হুযুরের ছবি সম্বলিত অনেকগুলো কার্ড ছাপান। হুযুর (আ.) যখন জানতে পারেন যে, কার্ডসমূহে অর্থাৎ পোস্টকার্ডে (তাঁর) ছবি ছাপানো হয়েছে, তখন হুযুর অনেক অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন- আমি একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নিজের ছবি তুলেছিলাম, আমি এটি মোটেই পছন্দ করি না যে, আমার ছবিকে উপার্জনের মাধ্যম বানানো হবে আর তা শিরকের দিকে নিয়ে নিয়ে যাবার কারণ হবে। অতএব এরপর সেই কার্ডগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়।"(রেওয়ায়েতে আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৮)

হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করি এবং আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে লিখি যে, আমি এই ধরনের ওযীফা পড়ে থাকি আর এটিও নিবেদন করলাম যে, যখন থেকে আমি আপনার বয়আত করে আসি, আমার মনে এই ধারণা আসে যে, যেখানে সাধারণ পীরদের মুরিদরা তাদের পীরের চিত্র নিজ হৃদয়ে অংকিত করার চেষ্টা করে সেখানে আমার নেতা ও মুর্শীদ যিনি খোদার প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী, আমি কেন আমার হৃদয়ে তাঁর চিত্র অংকন করবো না? অর্থাৎ আমার নিজ হৃদয়ে তাঁর চিত্র কেন অংকন করবো না? এরপর সেই প্রতিচ্ছবি স্মরণ করে নিজের সকল লক্ষ্য পূর্ণ করার চেষ্টা করবো। তাহলে তাঁর প্রতিকৃতি অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিকৃতি যা সেই সকল পীরের প্রতিকৃতি থেকে বেশী বরকতমণ্ডিত, উপকারী এবং যথোপযুক্ত হবে। তিনি (রা.) বলেন, আপনি তো প্রতিশ্রুত মসীহ- অন্যান্য পীরফকিরদের অনুসরণ বৈধ কিনা জানি না। মানুষ যেহেতু তাদের ধ্যান বা কল্পনা নিয়ে পড়ে থাকে, তাই আমি কেন সারাক্ষণ হৃদয়ে আপনারই কল্পনা নিয়ে চলব না? রাজেকী সাহেব বলেন, আমি যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে এটি লিখি, তখন হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের হাতের লেখা একটি চিঠি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে পাওয়া

গেল। তাতে লেখা ছিল, সৃষ্টজীবের কল্পনা বা ধ্যান শিরক ছাড়া আর কোনো ফল দেয় না।

তোমরা যে কল্পনা করো, তা থেকে শিরক ছাড়া আর কিছুই জন্ম নেবে না। আল্লাহ তা'লার যিকরের জন্য আল্লাহর নামই যথেষ্ট। আর দরুদ শরীফ সেটিই পড়া উচিত যার ওপর মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের মোহর রয়েছে।

এই চিঠি পাওয়ার পর আমি সেই মুহূর্তেই ধ্যান করা ত্যাগ করলাম এবং পূর্বের সব রীতিনীতি একেবারে বন্ধ করে দিলাম। (রেওয়ায়েতে আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৯-৩৩০)

হযরত মাস্টার সৈয়দ নযীর আহমদ সাহেব বলেন, কাদিয়ানে হিজরতকারী মরহুম সৈয়দ ফযল শাহ সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- একবার এক বন্ধু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে কিমিয়া (রসায়নবিদ্যা) সম্পর্কে জানতে চান। হুযুর (আ.) বলেন, অপরসায়নবিদরা রিযকের সন্ধানে এভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তারা সেই সঠিক উপায়গুলো কাজে লাগায় না যা আল্লাহ তা'লা বৈধভাবে রিযক লাভের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অপরসায়নবিদরা 'তাওয়াক্কুল' বা খোদা-নির্ভরতার দেখা পায় নি; তাই তারা সঠিক ও বৈধ পথ ছেড়ে নিজেরাই একটি পথ বানিয়ে নেয় এবং জানে না যে, খোদা বলেন- 'ফিস সামায়ি রিযকুকুম ওয়া মা তূআদুন' অর্থাৎ 'আকাশেই রয়েছে তোমাদের রিযক এবং যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।' আমরা তো এমন অপয়াদের সবচেয়ে বড়ো মুশরিক মনে করি। খোদা তাঁর পবিত্র কালামে মুমিনকে একটি রসায়নবিদ্যার শিখিয়েছেন, যার ওপর আমল করলে আল্লাহ তা'লা আকাশ থেকে রিযক দান করেন যেমনটি তিনি ওয়াদা করেছেন। কিন্তু তা কেবল তাদেরই ভাগ্যে জোটে যারা তাঁর দিকে ঝুঁকে। তিনি (আ.) বলেন, মুমিনকে এই রসায়নবিদ্যা শেখানো হয়েছে, যা পালন করলে মানুষ প্রকৃত রসায়নবিদ হয়ে যায় এবং খোদা তার প্রতিটি প্রয়োজন নিজেই পূরণ করে থাকেন। যেমন খোদা বলেন- وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বিপন্মুক্তির কোনো না কোনো পথ বের করে দেন। আর তিনি তাকে এমন স্থান থেকে রিযক দেন, যার ধারণাও সে করতে পারে না।আত-তালাক: ৩-৪) -অনুবাদক] লক্ষ করো! যখন মুত্তাকীকে উভয় জাহানের নিয়ামত দেওয়া হয় তখন সে আর কার মুখাপেক্ষী হতে পারে? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেন এবং এমন স্থান থেকে রিযক দেন যে, তাদের ধারণাও থাকে না। তিনি (আ.) বলেন, সমস্ত জগতের নিয়ামত যখন দেওয়া হয় তখন একজন মুত্তাকী আর কার মুখাপেক্ষী হতে পারে? আমি তো বলি, রসায়নবিদরা তাদের যে সময়টুকু রসায়নবিদ্যার পেছনে নষ্ট করে, তারা যদি তাদের স্রষ্টার জন্য সেই সময়টুকু ব্যয় করত, তবে তারা নিজেদের মনের সব ইচ্ছা পূরণ করতে পারত; শর্ত হলো তাদেরকে সঠিকভাবে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। (রেওয়ায়েতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৯)

পুণ্যবান মানুষের ওপর তাঁর তওহীদের বাণী এবং এজন্য তাঁর যে আমল ছিল সেটির প্রভাব কেমন হতো, সে সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একজন নিষ্ঠাবান বুযুর্গের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কাশ্মীরের বারামুলার রেঞ্জ অফিসার মীর আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে লিখে জানান-

আমার বাবা আগে হানাফী ছিলেন, পরে আহলে হাদীস হন। সে সময় তিনি তার বন্ধু মরহুম মৌলভী মুহাম্মদ হাসান সাহেবকে বলতেন, আমরা এখন বড়ো একত্ববাদী হওয়ার দাবি করি, হতে পারে এমন কোনো দল আসবে যারা আমাদেরও মুশরিক গণ্য করবে। বাবা বলতেন, শেষ পর্যন্ত তেমনই হলো। কারণ আমরা হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃতদের জীবিতকারী এবং পাখিদের সৃষ্টিকর্তা মনে করতাম। কিন্তু যখন আমার কানে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই কবিতাটি পৌঁছালো-সে নাকি অধিকাংশ পাখির স্রষ্টা! তোমার এমন খোদাত্বে জানাই সাধুবাদ। মৌলভী সাহেব! এটিই কি তওহীদ? সত্য করে বলো, তুমি কোনো দেবতার অনুসারী?

সেই মুহূর্তে আমার হুঁশ ফিরল এবং আমি তোমাদের দুই ভাইকে শ্রীনগরে আপন মামার কাছে রেখে আসি আর পায়ে হেঁটে কাদিয়ান চলে গেলাম। আর সেখানে গিয়ে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলাম। এ বিষয়টিই আমাকে তবলীগ করেছিল। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬০-১৬১)

হযরত মওলানা গোলাম রসুল রাজেকী (রা.) বর্ণনা করেন, সম্ভবত ১৯০১ সালের কথা। একবার আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মহান আল্লাহর তওহীদ সম্পর্কে একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন। আর সেখানে তিনি বলছিলেন,

কিছু মানুষ কারো উপকার লাভ করে 'আলহামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার) না বলে সরাসরি 'জাযাকাল্লাহ' (আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দিন) বলে দেয়। যদিও বাহ্যিকভাবে এটি সঠিক মনে হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিচারে এই ধরনের কথার মাঝে একপ্রকার শিরকের (অংশীদারিত্বের) ছাপ রয়ে যায়। কারণ অনুগ্রহকারীর সত্তা এবং যে জিনিসের মাধ্যমে সে অনুগ্রহকারী সাব্যস্ত হয়েছে- উভয়টিই সত্যিকারার্থে আল্লাহ তা'লার সৃষ্ট জিনিস। তাই অনুগ্রহে সিক্ত ব্যক্তির উচিত হলো- সে যেন 'জাযাকাল্লাহ' বলার আগে আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করে এবং অনুগ্রহ লাভের পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, কেননা সূক্ষ্মতত্ত্ব ও বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যক হলো, প্রথমে উপায়-উপকরণের স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা আদায় করা, তারপর সেই ব্যক্তিকেও 'জাযাকাল্লাহ' বলে দেওয়া। (হায়াতে কুদসি, পৃ: ১৩৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শেষ লাহোর সফরের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী লেখেন, "বেলা গড়ানোর সাথে সাথে ব্যবস্থাপকগণ দাওয়াতের প্রস্তুতি শুরু করলেন এবং একে একে সম্মানিত অতিথি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যানবাহন আসতে শুরু করল। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শারীরিক অবস্থা তখনও অত্যন্ত দুর্বল ও নড়বড়ে ছিল। শারীরিক দুর্বলতা ও অবসন্নতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, এমতাবস্থায় হুযূরের পক্ষে ভাষণ দেওয়া সম্ভব হবে বলে বিন্দুমাত্র আশা ছিল না। এই চিন্তা থেকেই হুযূর (আ.) হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর কাছে নির্দেশ পাঠালেন যে, আপনিই আগত মেহমানদের আধ্যাত্মিক খোরাকের (তথা ভাষণের) ব্যবস্থা করুন। তদনুসারে নির্ধারিত সময়ে হযরত মৌলভী সাহেব ভাষণ শুরু করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই উজ্জ্বল চন্দ্র ও দীপ্ত সূর্য সশরীরে আমাদের মাঝে উদিত হলেন। অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজেই সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব ভাষণ বন্ধ করলেন এবং হুযূর (আ.) পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সুধীকে সম্বোধন করে প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ অত্যন্ত তেজস্বী ভাষণ দিলেন। কোথায় সেই অসুস্থতা- যার কারণে উঠে দাঁড়ানোই কঠিন ছিল। আর যখন আসলেন এমনভাবে বক্তব্য রাখলেন যে, আপনজন তো বটেই, অপরিচিত ও বিরোধীরাও বিস্ময়ে ফেটে পড়ল। তারা এমনভাবে একাগ্র হয়ে শুনছিল যেন তারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই আধ্যাত্মিক ভোজের স্বাদ তারা এমনভাবে অনুভব করছিল যে, তা তাদের জাগতিক খাবারের চাহিদাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। হুযূরের ভাষণে এমন সাবলীলতা ছিল যে, তা লিখে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছিল। আর বক্তব্যের তেজ ও গাম্ভীর্য এতই প্রবল ছিল যে, ভরা মজলিসে কারো নিশ্বাসের শব্দও অনুভূত হচ্ছিল না। হুযূর এতটাই আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে ভাষণ দিচ্ছিলেন যে, বক্তব্যের ঝোঁকে তিনি নিজেই শ্রোতাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং ভালোমতো লক্ষ করেছি যে, হুযূর কয়েকবার মঞ্চের টেবিল থেকে কয়েক কদম সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। হুযূর টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন না, বরং টেবিলটি হুযূরের পেছনে ছিল। [অর্থাৎ (স্টেজে) যে টেবিল দেওয়া হয়েছিল তিনি (আ.) এর পেছনে না দাঁড়িয়ে বরং সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রদান করছিলেন। এজন্য বক্তৃতার সময় উদ্দীপনায় কখনো কখনো এক-দুই কদম সামনেও চলে যেতেন। হুযূর (এই) বক্তৃতা তাঁর মৃত্যুর সর্বোচ্চ দশ দিন আগে ডাক্তার সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ সাহেবের বাড়ির উঠানে প্রদান করেন। [দশ দিন পূর্বে (বক্তৃতা) প্রদান করে থাকবেন] যা 'তাকমিলে তাবলীগ' ও 'ইতমামে হুজ্জাত' নামে অভিহিত করা হতো আর ইতঃপূর্বে খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের বাড়ির ছাদে ইংরেজ জীববিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদেরকে সাথে আলোচনা হয়েছিল। অর্থাৎ তা একটি বড়ো ধরনের তবলীগি সফর ছিল। এসব বক্তৃতা ছাড়াও হুযূর ছোটো-বড়ো আরো অনেক বক্তব্য প্রদান করেন।

অতঃপর [তিনি (রা.)] লেখেন, সেই সময়- পয়গামে সুলেহ পুস্তক রচনার সময় হুযূর যখন ডাক্তার সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন (তখন) কতিপয় হিন্দু নারীদের একটি প্রতিনিধি দল হুযূরের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে উপস্থিত হয়েছিল, হুযূর যেহেতু অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন (তাই) তাদেরকে দ্রুত বিদায় জানাতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তারা অজুহাত দেখায় এবং জেদ ধরে আর এমনভাবে কোনো না কোনো উপদেশ প্রদানের জন্য আবেদন জানায়, হুযূর (আ.) সীমাহীন ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তাদের আবদেনকে মঞ্জুরি প্রদান

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ তিনি, যিনি পরম রিযকদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

করে তওহীদের অনুসরণ করতে উপদেশ প্রদান করেন এবং মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেন। খোদার নিকট দোয়া, প্রার্থনা করার প্রতি উপদেশ প্রদান করেন।

এই ঘটনাটি [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]-এর জীবনের অন্তিম সময়ের] শেষ দুই একদিনের ঘটনা। [প্রকৃতপক্ষে সেই নারী প্রতিধিদল দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতে এবং হুযূর (আ.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে চাচ্ছিল কিন্তু হুযূর (আ.)-এর ভীষণ ব্যস্ততার কারণে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রুত চলে গেছেন। অনুরূপভাবে হুযূর (আ.)-এর আরেকটি ভাষণ এর কতিপয় বাক্যাংশের জন্য, অধিকন্তু সর্বশেষ হবার কারণে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এবং খোদার ভাষ্য- যাতে হুযূর (আ.) বলেছিলেন,

"ঈসা মসীহ (আ.)-কে মরতে দাও আর এতেই ইসলামের জীবন নিহিত। মুহাম্মদী মসীহ (আ.)-কে আর্বিভূত হতে দাও, এর মাঝেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।" (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯১-৩৯৪-এর পরিশিষ্টাংশ)

এগুলো ছিল তাঁর (আ.) একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুলতা; অসুস্থতা ও ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বার্তা এবং একত্ববাদের বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ের পরোয়া করেন নি।

অতএব বর্তমানে মুহাম্মদী মসীহ (আ.)-এর দাসদের দায়িত্ব হলো এই তওহীদের বার্তা পৌঁছানোর এবং একে নিজেদের জীবনের অংশ বানানোর জন্য পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা করা। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য দান করুন।

পৃথিবীর (বর্তমান) অবস্থা, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে সবাই অবগত আছেন যে, কী ঘটছে! অনেক বেশি দোয়া (করা) প্রয়োজন। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু বেশি দিন টিকবে বলে মনে হচ্ছে না। বস্তুত এতে ইতোমধ্যেই ফাটল ধরতে শুরু করেছে। ইসরাঈলী সরকার কোনোভাবে লেবাননে আক্রমণ করে ইরানকে উসকানি দেবার চেষ্টা করছে যেন তারা পালটা আক্রমণ করে। এখন কতিপয় ইউরোপিয়ান নেতারা পর্যন্ত তাদের (ইসরাঈলের) এই কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছে। অন্ততপক্ষে কেউ না কেউ তো সোচ্চার হয়েছেন, এই লোকগুলো অন্তত কিছুটা নৈতিকতা দেখিয়েছে। কিন্তু তারা এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাদের নৈতিকতা এতটুকুই। এর বেশি তারা না চেষ্টা করতে চায়, না তাদের এর থেকে বেশি (কিছু করার) সাহস ও শক্তি আছে। সর্বোপরি আমাদের দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ তা'লা মুসলিম বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

(প্রকাশিত: আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ মে, ২০২৬)

১ম পাতার পর....

ইয়াওমিদ্দীন, সাত্তার, গফ্ফার, কুদ্দুস, মুহাইমিন, সালাম, জাব্বা, কাহ্হার এবং আল্লাহ তাআলার অন্যান্য গুণবাচক নামগুলোকে নিজেদের মনে গভীরভাবে স্থান দিই, তখন আল্লাহ তাআলার একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে গড়ে ওঠে। আর এর ফলেই আমাদের হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, আল্লাহর গুণাবলিকে বারবার স্মরণ করা এবং ধারাবাহিকভাবে জপ করার ফলে যেহেতু আল্লাহ তাআলার একটি ভাবমূর্তি আমাদের মনে গড়ে ওঠে, আর সেই ভাবমূর্তির কারণেই আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়, তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, যেমন একটি শিশুর হৃদয়ে তার মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকে, তেমনই তোমাদেরও আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এক গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকা উচিত।

অর্থাৎ, তোমাদের প্রকৃত শান্তি ও প্রশান্তি যেন কেবল আল্লাহ তাআলার সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকে। কারণ, তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি ও নির্ভরতা একমাত্র তাঁরই ওপর প্রতিষ্ঠিত।

হজের পর বিশেষভাবে আল্লাহর জিকিরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখন তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার একটি আধ্যাত্মিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং, যেমন একটি শিশু তার মা-বাবার স্নেহছায়ায় জীবন অতিবাহিত করে এবং তাদের চরিত্র ও অভ্যাস নিজের মধ্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করে, তেমনি তোমরাও আল্লাহ তাআলার গুণাবলির প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠো এবং তাঁর স্নেহ ও অনুগ্রহের ছায়াতলে জীবনযাপন করো।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন:

"অথবা তার চেয়েও অধিকভাবে স্মরণ করো।"

অর্থাৎ, প্রথমে আমি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করো, যেমন তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে। কিন্তু এই নির্দেশ মূলত তাদের জন্য, যারা এখনও আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উপনীত হয়নি।

অন্যথায়, যারা নিজেদের মা-বাবার প্রতি ভালোবাসার মধ্যেও আল্লাহর ভালোবাসারই প্রতিফলন দেখতে পায় এবং আল্লাহর তুলনায় মা-বাবার সম্পর্ককে সম্পূর্ণ তুচ্ছ মনে করে, তাদের উচিত আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করা, যার কোনো দৃষ্টান্ত তাদের পার্থিব সম্পর্কগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া না যায়। এমনকি মা-বাবার প্রতি স্মরণ ও ভালোবাসাও যেন আল্লাহর স্মরণের তুলনায় একেবারেই নগণ্য হয়ে পড়ে।

(তাফসীরে কবীর, খণ্ড ২, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২০১-এর তাফসীর)

২ পাতার শেষাংশ......

একসময় যে মর্যাদা ও সম্মান এটি লাভ করেছিল, তা এখন আর অবশিষ্ট নেই।

পশ্চিমা দেশগুলো প্রায়ই ছোট রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে শোষণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং এসব কর্মকাণ্ডের জন্য নতুন নতুন যুক্তি দাঁড় করানো হয়। বর্তমানে প্রায়ই বলা হয় যে, এসব পদক্ষেপ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব যুদ্ধের ফলে হাজার হাজার নারী অসহায় ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় উন্মুক্ত আকাশের নিচে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং চরম দুর্দশা ও বঞ্চনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একজন স্প্যানিশ সদস্য বলেছেন যে, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন এবং এখন ইরানের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ফলাফল আজ আমাদের সবার সামনে স্পষ্ট। আমরা জানি যে, শক্তিশালী ও অত্যাচারী রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই নিজেদের অন্যায্য যুদ্ধকে বৈধতা দেওয়ার জন্য এ ধরনের অজুহাত সৃষ্টি করে।

মুসলমান হিসেবে আমরা জানি যে, বহু ব্যক্তি ও সংগঠন ইসলামের নাম ব্যবহার করে অত্যাচার ও অন্যায়ের পথ বেছে নেয়। এরপর গণমাধ্যম তাদের কর্মকাণ্ডকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে, যার ফলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম হোক বা অন্য কোনো ধর্ম-কিছু ব্যক্তি যদি সেই ধর্মের নামকে অপব্যবহার করে অন্যায় কাজ করে, তবে সেই ধর্মকেই অত্যাচার ও বর্বরতার কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা নিজেই একটি অন্যায়।

সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই আমরা এ ধরনের আয়োজন করি, যাতে অন্তত কিছু মানুষের কাছেও আমাদের ন্যায় ও ইনসাফের বার্তা পৌঁছাতে পারে।

এই উদ্দেশ্যেই আমি বিশ্বের বহু শীর্ষ নেতার নিকট পত্র লিখেছি।

আমি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি এবং তাঁর সামনে তাওরাতের শিক্ষা উপস্থাপন করেছি। একইভাবে আমি ইরানের প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাদের কাছেও পত্র প্রেরণ করেছি। আমি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং চীনের প্রেসিডেন্টের কাছেও এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছি যে, তারা যেন গভীরভাবে চিন্তা করেন-কীভাবে পৃথিবী দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এখন মানবজাতির অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা এসব সতর্কবার্তার প্রতি খুব কমই মনোযোগ দিচ্ছে। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, তারা এসব কথা শুনতে চায় না। পৃথিবীজুড়ে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ ও সংঘাতই এ বাস্তবতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইসলাম তো এই শিক্ষা দিয়েছে যে, তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, পাছে তোমরা ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে, তোমরা দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং ন্যায়বিচার কায়েম করো। আর অন্যদের প্রতি শত্রুতাও যেন তোমাদেরকে অন্যায় আচরণ করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার অবলম্বন করাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

ইসলাম শুধু মিত্রদের অধিকারই প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং প্রতিদ্বন্দ্বীদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদের এই উপদেশ দিয়েছে যে, যদি তোমরা কোনো অন্য জাতির কাছ থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কোনো কথা পাও, তবে তা গ্রহণ করো; কারণ সেটি মূলত তোমাদেরই হারানো সম্পদ।

আজও বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ শান্তি কামনা করে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। পোপ যেমন বলেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় শুরু হয়ে গেছে। আমি আশঙ্কা করি যে, এই বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ অতীতের সব বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি ভয়াবহ ও বিধ্বংসী হবে।

আজ আমাদের সবার দায়িত্ব হলো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী রেখে যাওয়া এবং সে উদ্দেশ্যে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকেই দায়ী করবে এবং বলবে যে, তোমরা আমাদের জন্য কেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবী রেখে গিয়েছ।

সুতরাং এই পিস সিম্পোজিয়ামও সেই উদ্দেশ্যে একটি প্রচেষ্টা। আল্লাহ করুন, এটি যেন আশার প্রথম আলোকরশ্মিতে পরিণত হয় এবং বিশ্ব যেন এই যুগে শান্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ করুন, যুদ্ধের কালো মেঘ দূরীভূত হয়ে যাক এবং শান্তির উজ্জ্বল প্রভাত উদিত হোক।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

হযরত খলিফাতুল মসীহের (আই.) এই ভাষণ রাত ৭টা ৯ মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর পর হুযূর (আই.) দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার পর সকল অতিথির আপ্যায়নের জন্য খাবার পরিবেশন করা হয়।

খাবারের পর হুযূর (আই.) মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধান টেবিলে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য দান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ করেন। পরবর্তীতে হুযূর (আই.) প্রায় পৌনে আটটার সময় আইওয়ানে মাসরূর থেকে প্রস্থান করেন।

(পিস সিম্পোজিয়ামের অবশিষ্ট প্রতিবেদন পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।)

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ মে ২০২৬)

জাতীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা ২০২৬-এ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার সমাপনী বক্তৃতা

এপ্রিল ২০২৬ তারিখে,আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমানইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.) যুক্তরাজ্যের জাতীয় ওয়াকফেনও ইজতেমার সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। ইজতেমার শেষ অধিবেশনটি টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মাসরূর হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে তা সারা বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ২,১০০-এর অধিক পুরুষ সদস্য এই ওয়াকফে নও ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অধিবেশনটি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ (আ.)-এর রচিত একটি নযম (কবিতা) পরিবেশন করা হয়। এরপর ওয়াকফে নও যুক্তরাজ্য বিভাগের জাতীয় সেক্রেটারি সাহেব সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

এরপর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বর্তমান যুগে ওয়াকফে নও সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ প্রদান করেন।

ভাষণের শুরুতে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহর কৃপায়, আজ আপনারা জাতীয় ওয়াকফে নও ইজতেমায় একত্রিত হয়েছেন। ওয়াকফে নও সদস্য হিসেবে আপনারা একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, কারণ আপনারা এমন একটি দলের অংশ, যাদের পিতামাতা আপনাদের জন্মের পূর্বেই আপনাদের জীবনকে ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করার এক পবিত্র অঙ্গীকার করেছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, জামা'ত কখনোই সেই সকল ব্যক্তিকে বাধ্য করে না, যাদেরকে তাদের পিতামাতা এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেন তারা অবশ্যই এতে থেকে যায়। বরং যখন ওয়াকফে নও সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ও বোঝার বয়সে উপনীত হয়, তখন তারা চাইলে এই স্কীম থেকে সরে যাওয়ার স্বাধীনতা লাভ করে।

বোঝার বয়সে পৌঁছার পর জামা'ত আপনাদের প্রত্যেককে এই সুযোগ দেয় যে, আপনারা চাইলে আপনাদের পিতামাতার অঙ্গীকার নবায়ন করতে পারেন অথবা ওয়াকফে নও স্কীম থেকে সরে যেতে পারেন। তদুপরি, কেউ যদি সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাকে গুনাহগার মনে করা হবে না এবং তার প্রতি কোনো কঠোর বা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। বরং সত্যনিষ্ঠা এমন একটি বিষয়, যা মহান আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে চান এবং পছন্দ করেন। সুতরাং যদি আপনারা খোলামেলা ও সততার সঙ্গে বলেন যে, আপনারা ওয়াকফ (উৎসর্গ)-এর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নন, তবে তা করার পূর্ণ অধিকার আপনাদের রয়েছে।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, যারা নিজেদেরকে এই স্কীম থেকে সরিয়ে নিতে চায়, তাদেরও একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে প্রত্যাশিত গুণাবলি ও উচ্চ নৈতিক মান বজায় রাখা আবশ্যক। বিগত বছরগুলোতে কিছু মানুষ এই স্কীম থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং তাদের সর্বদাই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যদিও এটি তাদের নিজস্ব অধিকার, তথাপি তাদের আহমদী হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বরং তাদের সর্বদা বয়আতের শর্তসমূহ পালন করা এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব আদায়ের চেষ্টা করা উচিত।

অপরদিকে, যারা স্বেচ্ছায় তাদের ওয়াকফে নও-এর অঙ্গীকার নবায়ন করে, তাদের উচিত পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করার চেষ্টা করা এবং এই উপলব্ধি রাখা যে, একজন ওয়াকফে নও-এর নিকট যে পরিমাণ ত্যাগ ও নিষ্ঠা প্রত্যাশিত, তা সাধারণ আহমদীদের তুলনায় অনেক বেশি।

নিজের ভাষণে হুযূর (আই.) কিছু মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি আলোকপাত করেন, যা ওয়াকফে নও সদস্যদের নিজেদের মধ্যে গড়ে তোলা উচিত, যাতে তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষার আলোকে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

ওয়াকফে নও সদস্য হিসেবে আপনাদের মানসিকতা এমন হওয়া উচিত যে, এই নির্দেশনাগুলোর প্রধান প্রাপক আপনারাই এবং অন্যদের তুলনায় আরও অধিক উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলো অনুসরণ করা আপনাদের দায়িত্ব। যদি আপনারা এসব শিক্ষার আলোকে জীবন পরিচালনা করেন, তবে আপনারা প্রকৃত আহমদী মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে পারবেন এবং ওয়াকফে নও হিসেবে আপনাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর অন্যতম মৌলিক শিক্ষা ছিল এই যে, তাঁর অনুসারীদের সর্বদা সর্বোচ্চ নৈতিক মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে হবে এবং কখনোই নিজেদের আবেগ, রাগ বা অহংকারকে তাদের কথা বা আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া যাবে না।

সুতরাং ওয়াকফে নও সদস্য হিসেবে আপনাদের শুধু নিজেদের মধ্যে সর্বোচ্চ নৈতিক গুণাবলি প্রকাশ করলেই যথেষ্ট নয়; বরং আপনাদের অন্যদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংশোধনের মাধ্যম হিসেবেও ভূমিকা পালন করতে হবে। যদিও প্রত্যেক আহমদীরই একজন আদর্শ হওয়া উচিত, তথাপি ওয়াকফে নও সদস্যদের ওপর এই দায়িত্ব আরও বেশি, কারণ আপনারা শুধু প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে গ্রহণই করেননি, বরং ধর্মের সেবায় অগ্রভাগে থাকার এবং জাগতিক সব বিষয়ের ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারও করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) আরও বলেন, যদি ওয়াকফে নও সদস্যরা তাদের মৌলিক ইবাদতের দায়িত্বই পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মানুষ তাদের নৈতিক চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হবে না। বরং তারা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার তাদের দাবিকে ফাঁপা ও আন্তরিকতাহীন বলে মনে করবে।

তদুপরি, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ)-এর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অবশ্যই নিঃশর্ত ও অটল হতে হবে। একইসঙ্গে, আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকতে হবে।

একজন প্রকৃত মুমিন এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহর শক্তি ও মহিমা সম্পর্কে তার সচেতনতা তার মধ্যে এমন এক ভয় সৃষ্টি করবে, যার ফলে সে কখনো এমন কোনো কাজ করবে না, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। আল্লাহর প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা আপনাদের মধ্যে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি করা উচিত যে. যার মাধ্যমে আপনারা নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবেন এবং জামা'তের একজন নেক ও উপকারী সদস্যে পরিণত হবেন। মানুষ যখন আপনাদের দিকে তাকাবে, তখন তারা উপলব্ধি করবে যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর অনুসারীরা উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী এবং আল্লাহর মহিমা ও দয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ।

এরপর হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেক আহমদী-বিশেষত ওয়াকফে নও সদস্যদের-তাকওয়া (ধর্মভীরুতা ও আল্লাহভীতি)-তে উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। অন্য কথায়, তাদের প্রতিটি কাজ এমন হওয়া উচিত যা আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করার আন্তরিক ভয় দ্বারা পরিচালিত হয়। হুযূর (আই.) বলেন, তিনি প্রায়ই তাঁর জুমুআর খুতবায় এ বিষয়টি আলোচনা করেন, কারণ প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) শিক্ষা দিয়েছেন যে তাকওয়াই ইসলামের শিক্ষার সারবস্তু এবং আমাদের ঈমানের ভিত্তি।

তাকওয়া সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, নৈতিকতা ও ধার্মিকতার দাবি হলো আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা। যদি আমাদের কাজ আমাদের কথার বিরোধিতা করে, তবে তা প্রমাণ করে যে আমাদের অন্তরে মুনাফিকি প্রবেশ করেছে। এর অর্থ হলো আমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার ভয় রাখি না। ফলস্বরূপ, আল্লাহর পুরস্কার অর্জনের পরিবর্তে এমন ব্যক্তিরা গুনাহে নিমজ্জিত হয় এবং আল্লাহর অসন্তোষের পাত্রে পরিণত হয়।

অতএব, আপনাদের প্রত্যেকের উচিত আত্মসমালোচনা করা এবং নিজেকে প্রশ্ন করা যে, আপনারা কি সত্যিই এই উচ্চ মান অর্জনের জন্য চেষ্টা করছেন? যদি অতীতে কোনো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা থেকে থাকে, তবে আন্তরিকভাবে সংকল্প করুন যে আজ থেকে আপনারা নিজেদের জীবনে একটি আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন।

নিজেদের অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনার প্রতিটি কথা ও প্রতিটি কাজ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হবে। মনে রাখবেন, জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য কখনোই দেরি হয়ে যায় না।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা জামা'তের সদস্যদের বহু প্রতিভা ও যোগ্যতা দান করেছেন, কিন্তু সেগুলোকে অনর্থক কাজে নষ্ট করা উচিত নয়। তিনি বলেন, গত কয়েক দশকে একটি "প্রযুক্তিগত বিপ্লব" সংঘটিত হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে গুনাহ ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

নিঃসন্দেহে ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, গেমিং এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম অনৈতিকতা ও ভ্রান্ত তথ্যের প্রসারে সহায়তা করছে। এগুলো মানুষের মনকে কলুষিত করছে এবং তরুণদের নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও ধ্বংসাত্মক আসক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এসব প্ল্যাটফর্ম মূলত মানুষকে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং লাভের উদ্দেশ্যে ও ঈমানবিহীন নানা চিন্তাধারা প্রচারের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

এ ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের মুখে আপনাদের অবশ্যই পূর্ণ আত্মসংযম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

ক্ষণস্থায়ী প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের নৈতিকতা ও সম্ভাবনাকে ধ্বংস না করে, আপনাদের উচিত নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতাগুলোকে ইতিবাচক কাজে ব্যবহার করা। যারা এভাবে চলবে, আল্লাহ তাদেরকে অফুরন্ত পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

এরপর হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন,

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Seth Shamshuddin Sb., Barisha, 24 PGS (S)

যেখানে মহান আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই সফলতা মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত।" (সুরা আল-মু'মিনুন, ২৩:২)

হুযূর (আই.) বলেন, এই সফলতা অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) শিক্ষা দিয়েছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য দায়িত্ব।

নামাযে এমন গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে যান যে, যখন আপনারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার সামনে বিনয়ের সঙ্গে সেজদাবনত হন, তখন আপনাদের চোখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অশ্রু ঝরে পড়ে। তাঁর সাহায্য ও রহমতের জন্য দোয়া করুন, যেন আপনারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এবং গুনাহ থেকে দূরে থেকে পবিত্রতা অবলম্বন করতে সক্ষম হন।

একনিষ্ঠভাবে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আপনাদেরকে তাঁর প্রদত্ত প্রতিভা ও সামর্থ্যগুলো এমনভাবে ব্যবহার করার তৌফিক দান করেন, যা তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের পথ সুগম করে।

এটিই সফলতার চাবিকাঠি-এবং এটিই দোয়া কবুল হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে।

হুযূর (আই.) পুনরায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও তা অনুধাবনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং বলেন যে, প্রকৃত উৎকর্ষ, স্থায়ী সুখ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল চাবিকাঠি হলো পবিত্র কুরআন।

হুযূর (আই.) বলেন:

"সর্বদা মনে রাখবেন, পবিত্র কুরআনই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান পথপ্রদর্শক। এর অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকুন এবং এর সকল ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। যদি আপনারা এসব কুরআনি শিক্ষাকে নিজেদের চরিত্রের স্থায়ী অংশে পরিণত করেন, তবে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আপনাদের কথা তাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে।

কখনও কখনও তরুণদের মধ্যে এমন মানসিকতা সৃষ্টি হয় যে, সমাজে খাপ খাইয়ে নিতে হলে , সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তাদের ধর্মীয় পরিচয় গোপন রাখতে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি আপনারা নিজেদের ধর্মের প্রতি আন্তরিক থাকেন এবং যা বিশ্বাস করেন, সে অনুযায়ী জীবনযাপন করেন, তবে অন্যরা আপনাদের সম্মান করবে এবং মূল্যায়ন করবে। সুতরাং পবিত্র কুরআনের ঐশী জ্যোতিতে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করুন এবং এর প্রতিটি নির্দেশনা অনুসরণ করার চেষ্টা করুন।

এরপর হুযূর (আই.) উপস্থিত সকলের দৃষ্টি জ্ঞানার্জনের প্রতি আকর্ষণ করে বলেন যে, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয বা আবশ্যক। তিনি শিক্ষা দেন যে, প্রকৃত প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি সরাসরি তাকওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।

আল্লাহতে বিশ্বাসের দাবি করা সহজ, কিন্তু সেই দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে হলে সর্বদা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

একজন নাস্তিক বা অবিশ্বাসী তার অর্জনকে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল বলে মনে করতে পারে। নিঃসন্দেহে, যদি সে কঠোর পরিশ্রম করে, তবে কিছুটা সফলতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু যেহেতু সে ঐশী পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত, তাই তার জ্ঞান ও সক্ষমতা তাকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই নিয়ে যেতে পারে।

অতএব, যদি একজন নাস্তিক এবং একজন প্রকৃত মুমিন একই ক্ষেত্রে কাজ করে, তবে যে মুমিন আল্লাহর সাহায্য ও পথনির্দেশনা কামনা করে, সে শেষ পর্যন্ত অনেক বেশি সফলতা ও অধিক স্থায়ী ফলাফল অর্জন করবে।

হুযূর (আই.) আরও উৎসাহ প্রদান করেন যে, সবাই যেন জ্ঞানার্জনে এমন উৎকর্ষ সাধন করে যে তারা সর্বোচ্চ সম্মানের যোগ্য হয়ে ওঠে এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গণ্য হয়-যেমন ড. আবদুস সালাম পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ অবদান ও কৃতিত্বের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন।

আমাদের জামা'তে এ পর্যন্ত আমরা মাত্র একজন প্রকৃত অসাধারণ উদাহরণ পেয়েছি, যিনি বৈজ্ঞানিক জগতের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন-ড. আবদুস সালাম। তাঁর প্রতিটি যুগান্তকারী অর্জনের পেছনে তিনি পবিত্র কুরআন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন।

আজ আল্লাহর কৃপায় বহু আহমদী একাডেমিক জগৎ, গবেষণা এবং বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করছে। তাদের কাজ সহকমীদের দ্বারা স্বীকৃত হচ্ছে এবং তাদের অবদান নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তবুও, সামনে আরও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা বাকি। আমাদের জামা'তকে আরও বহু এমন মানুষ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে, যারা মানব-জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে এবং একই সঙ্গে আল্লাহর মহিমার সাক্ষ্য বহন করবে।

যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তারা হয়তো তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারে। কিন্তু একজন মুমিন যদি আল্লাহর সাহায্যকে উপেক্ষা করে এবং তার অর্জনকে কেবল নিজের প্রচেষ্টার ফল বলে মনে করে, তবে সে মুনাফিকি ও আত্মপ্রতারণার অপরাধে লিপ্ত হয়। সুতরাং সফল হওয়ার জন্য একজন মুমিনকে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং এর সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিক দোয়াকে যুক্ত করতে হবে।

যদি একজন আহমদী এভাবে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করে, তবে সে আল্লাহর বরকতকে প্রবল বৃষ্টিধারার ন্যায় অবতীর্ণ হতে দেখবে এবং একের পর এক সফলতা অর্জন করবে।

হুযূর (আই.) আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর যুগে কিছু ধর্মীয় নেতা ও আলেম মনে করতেন যে বিজ্ঞান বিপজ্জনক এবং এটি মানুষকে ধর্ম ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং তারা একে অপরের সহযাত্রী।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেছেন, মানব-জ্ঞান এবং ঐশী জ্যোতি উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে; সুতরাং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। তিনি তাঁর অনুসারীদের আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন যে, যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, কিছু ধর্মীয় ব্যক্তির আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবই তাদেরকে বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করেছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, যুক্তি ও জ্ঞান হলো আকাশ থেকে অবতীর্ণ এক ধরনের আধ্যাত্মিক জ্যোতি। আর যেসব মেধাবী মন তা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে, তারা সর্বদা জ্ঞানের অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকে।

তিনি (আ.) একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন: যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন তার প্রভাব নির্ভর করে জমির প্রকৃতির ওপর। যদি বৃষ্টি উর্বর ভূমিতে পড়ে, তবে সেই ভূমি তা গ্রহণ করে এবং সুন্দর ফুল ও সমৃদ্ধ ফসল উৎপন্ন করে। কিন্তু একই বৃষ্টি যদি অনুর্বর জমিতে পড়ে, তবে সেখান থেকে কেবল আগাছা ও কাঁটা জন্মায়।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেছেন, মানুষের বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। যদি কোনো ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সমগ্র জগতের স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টিকে বোঝার চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ তার মনকে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেন যে.তখন সে উন্নতি ও অগ্রগতিতে অন্যদের ছাড়িয়ে যায়। তার মন তখন এক উর্বর ভূমির ন্যায় হয়ে ওঠে, যা এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, যা অন্যদের নিকট অদৃশ্য থেকে যায়।

এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) তাঁর অনুসারীদের কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনেরই আহ্বান জানাননি; বরং তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন নিজেদের আবিষ্কার ও অগ্রগতিকে ইসলামের সত্যতা প্রমাণের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, এটি ওয়াকফে নও সদস্যদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

যে সময়ে নাস্তিকরা বিজ্ঞানকে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, সে সময়ে বিশেষত যাদের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ ও দক্ষতা রয়েছে, তাদের দায়িত্ব হলো বিজ্ঞানকেই আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা।

যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ও আপত্তিগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করুন।

ভাষণের শেষাংশে হুযূর (আই.) পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব এবং গৃহে সর্বোচ্চ নৈতিক মান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষে জোর দেন।

নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালোবাসা ও সহানুভূতির আচরণ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে, আপনাদের ঘরে সর্বদা ভালোবাসা, মমতা ও স্নেহের পরিবেশ বিরাজ করে। এভাবেই আপনাদের পারিবারিক জীবনও ওয়াকফে নও-এর বরকতের এক জীবন্ত সাক্ষ্যে পরিণত হবে।

সবশেষে হুযূর (আই.) এই দোয়া করেন:

"মহান আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সবাইকে আমার কথাগুলো বুঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, যাতে আপনারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হন এবং অন্যদেরও আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে পারেন। মহান আল্লাহ আপনাদেরকে মানবতার জন্য স্থায়ী কল্যাণের উৎসে পরিণত করুন এবং ওয়াকফে নও সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। তিনি যেন আপনাদেরকে সারাজীবন ইসলাম আহমদিয়াতের সেবায় সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত থাকার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন।"

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

হযরত ইসমাঈল ও হযরত হাজেরার সম্বন্ধে কতিপয় আপত্তির জবাব

এখানে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কিছু খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) আরবে এসে বসবাস করেছিলেন-এ বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সুতরাং তাদের মতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ ? যে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, তাও প্রমাণিত নয়। তদুপরি তারা দাবি করে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর যে পুত্রকে কুরবানি করতে চেয়েছিলেন, তিনি বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইসহাক (আ.) ছিলেন, হযরত ইসমাঈল (আ.) নন। এই উভয় আপত্তির সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নে প্রদান করা হলো।

প্রথম আপত্তির জবাব হলো-

১. হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আরবে এসে বসবাস করা এবং মক্কার কুরাইশ গোত্রের তাঁর বংশধর হওয়া আরবদের সর্বসম্মত ঐতিহ্য ও বর্ণনার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। আরবদের মধ্যে এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না, যা এর বিরোধিতা করে-না মহানবী ?-এর যুগের পূর্বে, না তাঁর যুগের পরে। কোনো জাতির ইতিহাস সম্পর্কে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হলো সেই জাতির নিজস্ব নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য ও বর্ণনা। অতএব, এই সাক্ষ্যের উপস্থিতিতে কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে না যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) আরবে এসে বসবাস করেছিলেন এবং কুরাইশ গোত্র তাঁরই পবিত্র বংশধর ছিল।

২.পবিত্র কুরআনও-যার ঐতিহাসিক সত্যতা বন্ধু ও শত্রু উভয়ের কাছেই স্বীকৃত-কুরাইশকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৩. বাইবেল থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত সারার অসন্তুষ্টির কারণে হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত হাজেরা (আ.) তাঁদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এখন যদি হিজাজ সেই দেশ না হয়, যেখানে তাঁরা এসে বসবাস করেছিলেন, তাহলে সেই স্থান কোনটি, যেখানে তাঁদের বংশধরদের পাওয়া যায়?

৪.বাইবেল আরও প্রমাণ করে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাতা এমন এক নির্জন ও অনাবাদী স্থানে গিয়ে বসবাস করেছিলেন, যেখানে খাদ্য-পানীয়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং কোনো জনবসতিও ছিল না। এই বর্ণনা মক্কার অনুর্বর ও জনশূন্য উপত্যকার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ।

৫.তদুপরি, বাইবেল থেকেই এ কথা প্রমাণিত হয় যে, স্বদেশ ত্যাগের পর হযরত হাজেরা (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) ফারান নামক স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। ফারান শব্দের অর্থই যেহেতু একটি অনাবাদী ও অনুর্বর স্থান, তা ছাড়াও আরব ভূগোলবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, ফারান হলো মক্কা বা হিজাজের পাহাড়মালার নাম। যারা আরব ভ্রমণ করেছেন, তারা জানেন যে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী ওয়াদি ফাতিমায় যেসব শিশু 'গুলে-জাযীমা' ফুল বিক্রি করে, তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে যে এই ফুল কোথা থেকে আনা হয়েছে, তারা উত্তর দেয়- "মিন বারিয়্যাতে ফারান, অর্থাৎ "ফারানের প্রান্তর থেকে"। এই সাক্ষ্যের উপস্থিতিতে যদি অন্য কোথাও ফারান নামে কোনো স্থান থেকেও থাকে, তবুও ইসমাঈলীয় বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ফারানকে অবশ্যই হিজাজের ফারান বলে বুঝতে হবে, অন্য কোনো স্থান নয়।

৬. বাইবেলে আরও উল্লেখ আছে যে, স্বদেশ ত্যাগের পর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধররা "হাবীলা থেকে শূর পর্যন্ত" অঞ্চলে বসবাস করত। খ্রিষ্টান গবেষকরাও স্বীকার করেছেন যে, হাবীলা ও শূর দ্বারা আরবের সংলগ্ন অঞ্চলসমূহকেই বোঝানো হয়েছে।

৭. হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সম্পর্কে বাইবেলে "বন্য মানুষ" বা "মরুপ্রান্তরের অধিবাসী" ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই বর্ণনা হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর মক্কায় বসবাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, 'আরব' শব্দের অর্থও মূলত মরুভূমি বা অনুর্বর অঞ্চল। যেমন 'আ'রাব' শব্দ দ্বারা মরুভূমিবাসী লোকদের বোঝানো হয়।

৮.খ্রিষ্টানদের বিখ্যাত ধর্মগুরু পলুস (Saint Paul) এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাতা হযরত হাজেরার সঙ্গে আরবের সম্পর্ক রয়েছে।

৯.কেদার, যিনি সর্বজনস্বীকৃতভাবে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বাইবেল থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বংশধররা আরবে বসবাস করত।

১০.এই একই কেদার ইবনে ইসমাঈল সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়ায় নিম্নলিখিত কথা উল্লেখ রয়েছে-

"তিনি ছিলেন ইসমাঈলের এক পুত্র, যার বংশধররা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করেছিল।"

উপরোক্ত যুক্তিসমূহ থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) আরবে বসবাস করেছিলেন এবং আরব জনসংখ্যার একটি অংশ তাঁরই বংশধর। যখন এই বিষয়টি প্রমাণিত, তখন সেই শক্তিশালী আরব ঐতিহ্য ও বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা, যেগুলো থেকে কুরাইশদের হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হওয়া প্রতীয়মান হয়, কোনোভাবেই ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো-যবীহ (যাকে কুরবানি করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল) কে ছিলেন? অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের মধ্যে কাকে আল্লাহর পথে কুরবানি করার সংকল্প করেছিলেন? এ বিষয়ে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মনে রাখা উচিত তা হলো, এই প্রশ্নটির কোনো বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। হযরত ইসমাঈল (আ.) যবীহ প্রমাণিত হোন বা হযরত ইসহাক (আ.), এতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবিসমূহ বা ইসলামের কোনো মৌলিক নীতির উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। তবে একটি ঐতিহাসিক বিষয় হিসেবে অবশ্যই এটি অনুসন্ধানের যোগ্য যে, যবীহ কে ছিলেন?

যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, আমাদের মতে সঠিক অবস্থান হলো-যবীহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) নন। নিঃসন্দেহে বাইবেলে হযরত ইসহাক (আ.)-কে যবীহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রথমত, বাইবেলের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা খুব শক্তিশালী নয়। দ্বিতীয়ত, বাইবেলের নিজস্ব বর্ণনাই এই দাবিকে ভুল প্রমাণ করে এবং ইসলামী ঐতিহ্যের সাক্ষ্যও এ সিদ্ধান্তকে আরও শক্তিশালী করে। যাই হোক, এ বিষয়ে আমাদের যুক্তিগুলোর সারাংশ নিম্নরূপ-

১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নেক ও সৎ সন্তান কামনা করে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। যখন সেই পুত্র কিছুটা বড় হলো, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁর সেই পুত্রকে কুরবানি করছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পথে তাঁর পুত্রকে বাস্তবিক অর্থে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং পুত্রও আল্লাহর আদেশের সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পুত্রকে শুইয়ে দিয়ে তার গলায় ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ফেরেশতা তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত করলেন ইত্যাদি। এরপর কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইসহাকের সুসংবাদ দিলেন।

এই বর্ণনা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যেই পুত্রকে কুরবানি করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রস্তুত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আ.), ইসহাক (আ.) নন। কারণ পবিত্র কুরআন প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উল্লেখ করে তার সঙ্গে কুরবানির ঘটনাকে সংযুক্ত করেছে এবং তারপর ইসহাক (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ বর্ণনা করেছে। যদি ইসহাক (আ.)-ই যবীহ হতেন, তবে কুরবানির ঘটনাটি তাঁর সঙ্গেই সংযুক্ত হওয়া উচিত ছিল, জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে নয়।

২. পবিত্র কুরআনে আরও উল্লেখ আছে যে, যখন আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইসহাক (আ.)-এর সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তখন একই সঙ্গে ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আ.)-এরও সুসংবাদ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ একই সময়ে পুত্র ও পৌত্র উভয়েরই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এখন যখন শুরু থেকেই ইসহাক (আ.)-এর সঙ্গে ইয়াকুব (আ.)-এর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীও বিদ্যমান ছিল, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কীভাবে ইসহাক (আ.)-কে বাস্তবিক অর্থে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত হতে পারতেন, যখন তিনি জানতেন যে ইসহাক (আ.)-এর জীবন অন্তত ততদিন পর্যন্ত নির্ধারিত, যতদিন না তাঁর ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়?

৩. একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলতেন-

"আমি দুই যবীহের সন্তান (আনা ইবনু যাবিহাইন)।"

অর্থাৎ তাঁদের একজন ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং অপরজন ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, যাঁকে মহানবী (সা.)-এর দাদা একটি মানতের কারণে কুরবানি করতে চেয়েছিলেন এবং তিনিও এর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই হাদিস অন্তত এতটুকু প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে সঠিক ও প্রতিষ্ঠিত মত ছিল এই যে, যবীহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) নন।

৪. বাইবেল থেকে জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে প্রথম সন্তানকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। যেহেতু উৎসর্গ বা ওয়াক্‌ফ আধ্যাত্মিক অর্থে কুরবানির সমার্থক, তাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে এই রীতির প্রচলনও এ বিষয়টিকেই সমর্থন করে যে, যবীহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। কারণ তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আর ইসহাক (আ.) ছিলেন কনিষ্ঠ।

৫. কুরবানির সঙ্গে সম্পর্কিত যত জাতীয় রীতি-নীতি ছিল, সেগুলো আরবদের মধ্যে পাওয়া যেত এবং আজও তাদের মধ্যে অনেকগুলো বিদ্যমান। কিন্তু এ ধরনের কোনো রীতিই বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটি এ বিষয়ে একটি শক্তিশালী প্রমাণ যে, যবীহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) নন। কারণ যদি হযরত ইসহাক (আ.)-ই যবীহ হতেন, তবে এই রীতিগুলো বনী ইসরাঈলের মধ্যে সংরক্ষিত থাকার কথা ছিল, বনী ইসমাঈলের মধ্যে নয়। কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

উদাহরণস্বরূপ, বাইবেল থেকে জানা যায় যে, যেসব ব্যক্তির জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত হতো-যা কুরবানির প্রকৃত তাৎপর্য-তাঁরা মাথার চুল মুণ্ডন করা থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু বাইবেল যদিও ইসহাক (আ.)-কে যবীহ বলে দাবি করে, তথাপি বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন কোনো রীতি দেখা যায় না, যাকে সেই কুরবানির স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, আরবদের মধ্যে-যারা নিজেদেরকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর বলে দাবি করে-এই রীতি ইসলাম-পূর্ব যুগেও বিদ্যমান ছিল এবং ইসলামের আবির্ভাবের পরও তা অব্যাহত থাকে।

সুতরাং হজের সময় কুরবানি করার পূর্বে আরবদের মধ্যে মাথার কেশ মুণ্ডন বা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 4 June, 2026 Issue No.23

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ছাঁটা থেকে বিরত থাকার একটি প্রথা ছিল এবং এই প্রথা ইসলামের মধ্যেও অব্যাহত রয়েছে। একইভাবে, আরবদের মধ্যে হজের সময় পশু কুরবানি করারও একটি প্রচলন ছিল, যা সেই দুম্বার কুরবানির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ছিল, যে দুম্বাটি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে কুরবানি করা হয়েছিল। এই প্রথাটিও ইসলামে বহাল রয়েছে। কিন্তু বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ধরনের কোনো প্রথা দেখা যায় না। এই উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, কুরবানির উত্তরাধিকার হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধররাই লাভ করেছে, হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধররা নয়। আর এটি সুস্পষ্ট যে, যে জাতি এই উত্তরাধিকার লাভ করেছে, তাদেরই পূর্বপুরুষকে যবীহ (কুরবানির জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি) বলে গণ্য করা উচিত।

৬. বাইবেলে কুরবানির স্থান, অর্থাৎ বেদী বা কুরবানিগাহকে "মোরিয়াহ"(Moriah) বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই স্থানটি কোথায় অবস্থিত সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়নি। কেবল এটুকু বলা হয়েছে যে, এটি একটি পাহাড়ি স্থান ছিল। বাইবেলে এই স্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ না থাকায় ইহুদি ও খ্রিষ্টান আলেমদের মধ্যেই এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে এই স্থানটি কোথায় ছিল এবং কোন স্থানকে বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই নাম ও এর বর্ণনা মক্কার নিকটবর্তী 'মারওয়া' পাহাড়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায়। নামের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে, তা ভাষাভেদজনিত কারণে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে না। বিভিন্ন ভাষায় শব্দের রূপান্তরের ফলে এ ধরনের পরিবর্তন স্বাভাবিক।

নিঃসন্দেহে বর্তমানে হজের সময় কুরবানি মারওয়ার নিকটে করা হয় না, বরং মিনায় করা হয়। কিন্তু প্রথমত, মিনা ও মারওয়া একে অপরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, মহানবী হযরত মুহাম্মদ ?-এর একটি হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূল কুরবানিগাহ ছিল মারওয়াই। পরবর্তীকালে হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কুরবানির স্থান জনবসতি থেকে কিছুটা দূরে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

৭. যদিও বাইবেল হযরত ইসহাক (আ.)-কে যবীহ (কুরবানির জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি) হিসেবে উল্লেখ করে, তথাপি এই ঘটনার বিবরণে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা হযরত ইসহাক (আ.)-এর উপর নয় বরং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর উপর অধিকতর প্রযোজ্য। কুরবানির ঘটনাটি বাইবেলের 'আদিপুস্তক' (Genesis)-এ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে যেখানে ইসহাক (আ.)-কে যবীহ বলা হয়েছে, একই সঙ্গে তাঁকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর "একমাত্র পুত্র"বলেও অভিহিত করা হয়েছে। অথচ এটি সুস্পষ্ট যে, হযরত ইসহাক (আ.) কোনো অবস্থাতেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র বলে বিবেচিত হতে পারেন না। যদি কাউকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র বলা যেতে পারে, তবে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)। কারণ হযরত ইসমাঈল (আ.) তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বাস্তবিক অর্থেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। কিন্তু হযরত ইসহাক (আ.) কখনোই এই অবস্থান লাভ করেননি।

এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মূলত বাইবেলেও হযরত ইসমাঈল (আ.)-কেই যবীহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবেগে প্রভাবিত হয়ে ইহুদি আলেমগণ ইসমাঈলের নাম পরিবর্তন করে ইসহাকের নাম সংযোজন করেন। তবে কিছু বিবরণ অপরিবর্তিত থেকে যায়, যা আজও এই পরিবর্তনের বিষয়টি প্রকাশ করে দেয়।

অনুরূপভাবে, বাইবেলের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর পুত্রকে কুরবানি করা থেকে বিরত রাখা হলো, তখন আল্লাহ তাঁকে বললেন-

"তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও আমার জন্য উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হওনি; অতএব আমি তোমার বংশকে মহা বরকত দান করব এবং তোমার বংশধরের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি বরকত লাভ করবে।"

এই কথাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, যবীহ সেই পুত্র ছিলেন, যার বংশধরদের মধ্য থেকে এমন এক মহান নবীর আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, যিনি জাতি, বর্ণ ও গোত্রের ভেদাভেদ ছাড়াই সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত হবেন।

এটি সুস্পষ্ট যে, এই প্রতিশ্রুতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। কারণ তিনিই সেই নবী, যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন-

"আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষ বিশেষ জাতির প্রতি প্রেরিত হতেন, কিন্তু আমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।"

অপরদিকে, বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা নাসরী (আ.)-এর নিম্নোক্ত উক্তিগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়-

"আমি কেবল ইসরাঈল বংশের হারিয়ে যাওয়া মেষগুলোর কাছেই প্রেরিত হয়েছি।" এবং পুনরায়-

"সন্তানদের রুটি নিয়ে কুকুরদের সামনে ফেলে দেওয়া সমীচীন নয়।"

ইসরাঈলী নবীদের এই সীমিত দায়িত্বের বিপরীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সর্বজনীন দাওয়াত এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত প্রমাণ যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি-যে তাঁর যবীহ পুত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি বরকত লাভ করবে-তা হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশে নয়, বরং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে পূর্ণ হয়েছে। আর এটিও প্রমাণ করে যে, যবীহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) নন।

এই আলোচনা সমাপ্ত করার পূর্বে আরেকটি আপত্তির জবাব দেওয়া প্রয়োজন, যা কিছু পক্ষপাতদুষ্ট খ্রিষ্টান হযরত হাজেরা (আ.)-এর সম্পর্কে উত্থাপন করে থাকে। তাদের দাবি হলো, হযরত হাজেরা (আ.) কেবলমাত্র একজন দাসী বা বাঁদী ছিলেন, আর হযরত সারা (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রকৃত স্ত্রী। সুতরাং, তাদের মতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন দাসীর বংশধর।

এই আপত্তির উত্তরে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে, এটি মূলত হিংসা ও বিদ্বেষের ফল। অন্যথায় একই ব্যক্তি একই সময়ে দুটি পরস্পরবিরোধী দাবি করতে পারে না-একদিকে বলে যে মহানবী (সা.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর নন, আর অন্যদিকে বলে যে তিনি একজন দাসীর বংশধর। এই দুই বক্তব্য একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আপত্তিকারীদের উদ্দেশ্য হলো, যদি একটি আপত্তি কার্যকর না হয়, তবে অন্যটি যেন তার স্থান গ্রহণ করতে পারে। তাই তারা একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী যুক্তি উপস্থাপন করে।

প্রকৃতপক্ষে, উভয় আপত্তিই অসত্য ও অকার্যকর। মহানবী (সা.) যে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, সে বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আর হযরত হাজেরা (আ.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির উত্তর হলো-প্রথমত, তিনি যে দাসী ছিলেন, এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত ও অকাট্য প্রমাণ নেই। আরবি গ্রন্থসমূহে সাধারণত তাঁর জন্য 'জারিয়াহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ দাসীও হতে পারে, আবার সাধারণভাবে কোনো তরুণী মেয়েও হতে পারে।

তবে যদি ধরে নেওয়াও হয় যে, জীবনের কোনো এক সময়ে হযরত হাজেরা (আ.) দাসত্বের অবস্থায় ছিলেন, তবুও এ বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন তাঁকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদায় গ্রহণ করেছিলেন, দাসীর মর্যাদায় নয়।

অধিকন্তু, যদি জীবনের কোনো সময়ে দাসত্বের মধ্যে থাকা নিন্দার বিষয় বলে বিবেচিত হয়, তবে সমালোচকদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত সারা (আ.) নিজেও এ ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) মিসরে গিয়েছিলেন, তখন মিসরের রাজা হযরত সারাকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের অন্দরমহলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং কিছু সময় পর তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন।

একইভাবে, বনী ইসরাঈলের মহান পূর্বপুরুষ হযরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ.)-এর মিসরে দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে যাওয়া এবং দীর্ঘকাল সেই অবস্থায় জীবনযাপন করা এমন একটি সুপরিচিত ঘটনা, যা স্কুলের অল্পবয়সী শিশুরাও জানে। অতএব, যদি হযরত হাজেরা (আ.)-এর জীবনের কোনো অংশ দাসত্বে অতিবাহিত হয়েও থাকে, তবুও তা কোনো বৈধ নিন্দা বা আপত্তির ভিত্তি হতে পারে না।

তবে সত্য কথা হলো, হযরত হাজেরা (আ.) যে দাসী ছিলেন, সেটিই প্রমাণিত নয়। বরং যা কিছুটা প্রমাণিত বলে প্রতীয়মান হয় তা হলো-মিসরের রাজা যখন তাঁর অনুচিত আচরণের পর হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত সারা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও মর্যাদায় গভীরভাবে প্রভাবিত ও অভিভূত হলেন, তখন তিনি শুধু সারাকে মুক্তই করেননি, বরং তাঁর নিজ গৃহ থেকে এক সম্ভ্রান্ত ও প্রতিভাবান তরুণীকেও তাঁদের নিকট উপহার হিসেবে পেশ করেছিলেন। সেই তরুণীই ছিলেন হযরত হাজেরা (আ.)।

বাইবেল ও ইসলামী ঐতিহ্য উভয়েই বর্ণনা করে যে, মিসরের রাজা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত সারা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক শক্তি, মহত্ত্ব ও মর্যাদায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে এটি মোটেও অসম্ভব নয় যে, হাজেরা (আ.) স্বয়ং রাজার নিকটাত্মীয়দের মধ্যকার একজন সম্ভ্রান্ত তরুণী ছিলেন, যাঁকে তিনি হযরত সারার প্রতি সংঘটিত নিজের অন্যায়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁদের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই পরবর্তীকালে তাঁকে একজন পরিচারিকা বা সেবিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি কেবল একটি অনুমান নয়; বরং কিছু প্রাচীন গবেষক এটিকে একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, দিবশলোম (Dibshelom) নামক একজন ইহুদি পণ্ডিত তাঁর তাওরাতের ব্যাখ্যায় এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে, হযরত হাজেরা (আ.) প্রকৃতপক্ষে মিসরের রাজার নিজ কন্যা ছিলেন, যাঁকে তিনি হযরত সারার আধ্যাত্মিক মহিমা ও অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পর তাঁর সেবায় অর্পণ করেছিলেন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir